কেক চকোলেট আর রূপকথা

কমল দাশ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রাকর
যামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

ভরতকে

এই লেখিকার

জানা অজানা

উত্তরে মেরু দক্ষিণে বন

অমৃতস্য পুত্রী

না। কোন পেস্‌ট্রি চকোলেটের লোভে যে আবার সুইট্‌জারল্যাণ্ডে চলে এলাম তা নয়।

অবশ্য তা যদি করতাম, তা হলেও আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের এই সাধু উদ্দেশ্যে সায় দিতেন।

কে না জানে সংসারের সেরা পেস্‌ট্রি তৈরী করে এদেশের লোকেরা। সুইস কনফেকশনারীর স্বাদের তুলনা নেই। জলো দুধ আর ভেজাল ক্রীমের লাকড়ী মার্কা চকোলেটের শহর এই কলকাতা। যেখানে দেখি সাহেবী সুইটগুলো সুইস কনফেকশনারীর তৈরী সেখানে ভরসা হয় যে ওরই মধ্যে একটু ভাল পেস্‌ট্রি চকোলেট পাব।

অমনি মনটা খুশীতে ছেলেমানুষ বনে যায়।

কিন্তু কোথায় পাব সেই জল আর হাওয়া, দুধ আর ক্রীম, আর রূপকথা, যার ময়ান না পড়লে সেরা মিষ্টি তৈরী হয় না?

সেই রূপকথারই মত গল্প ঠাকুমার ঝুলি থেকে বের করলেন আমাদের হঠাৎ চেনা সুইস বন্ধু।

লেক জেনিভার পারে ছোট্ট মামুলী একটা 'পাতিসেরী'ও এমন পেস্‌ট্রি তৈরী করে যার তুলনা নেই। নেই এ ভুবনে।

আর এখন ত বসে আছি জেনিভা লেকেরই পারে। কিন্তু সাত মাইল দূরে। সাত সমুদ্রের ওপারেই যেন। কারণ এটা নাকি একটি গ্রাম। রেস্তোরাঁটা শ দুই বছর আগের স্টাইলে সাজানো, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আলোটা হচ্ছে মিট্‌মিটে মোমবাতির।

সামনে প্লেটে মামুলী কিন্তু তুলনাহীন ডেজার্ট অর্থাৎ খানাশেষের মিষ্টি। নাম ক্রেপ সুজেৎ।

পশ্চিম পৃথিবীর সব বড় বড় হোটেলে সেরা রসুইরা হচ্ছে পুরুষ। সেখানে কোন ভোজনরসিক সম্রাটের একদিন তার শেফ দ্য ক্যুজিনের

অর্থাৎ সর্দার-রসুয়ের বানানো খানদানী কোন মিঠাইই মুখে রুচল না। নতুন কিছু চাই। একেবারে আনকোরা নতুন।

তখন তার রসুইখানার মেড সুজেৎ শুধু ডিম আর জ্যাম দিয়ে এমন একখানা নরম পুডিং বানাল যা ডেজার্ট পেস্ট্রির লিস্টে তার নাম অমর করে দিয়েছে।

কবেকার রূপসী রাঁধুনী সুজেৎ একেবারে রূপকথা হয়ে গেল।

সেই ক্রেম সুজেৎ পাতে নিয়ে ভাবছি যে পেস্ট্রির দেশে আসাটা সার্থক হয়েছে। চাইনিজ সিল্কের মত মিহি অথচ খাস্তা এই সুইস পাটিসাপটার পরতে পরতে মিষ্টি মন্নানের ছোঁয়া।

দেশ থেকে প্রথম পরদেশে নেমেছিলাম জেনিভাতে। স্টপ্ওভার হিসাবে। মানে, প্লেন কোম্পানীর দৌলতে। বিনা পয়সায় দেড়-দিনের সফর।

অতৃপ্ত মন নিয়ে জেনেছিলাম জেনিভাকে। এত কিছু দেখবার দেশকে দেখা কি দেড় দিনে যায়?

মনটা বেশ খারাপ লাগছিল। আবার অন্যদিকে মেয়ে রয়েছে লণ্ডনে। কতদিন দেখি না। তাই জেনিভা যত সুন্দরীই হোক না কেন, দেড় দিনের বেশী এক মুহূর্তও থাকা সম্ভব নয়। সে টান যে পৃথিবীর সব চাইতে বড় টান। তাই লণ্ডনের দিকে রওনা হলাম।

প্লেনে উঠবার সময় বলেছিলাম, "তোমাকে চেনা হোল না, জানা হোল না। আবার আসব তোমার কাছে।"

সেই কথা কানে গিয়েছিল বলেই বোধহয় পিছুটান পড়ল। জেনিভা দিয়েই সুরু হোল আমার এবারের যাত্রা।

লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়েছি তিনজনে। মনে আশা সুইজারল্যাণ্ডটা দেখব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ছোটবেলা থেকেই সাধ ছিল একে দেখবার; কিন্তু সাধ্য ছিল না।

অনেকের ধারণা জন ক্যালভিনের নাম থেকে জেনিভা নামের শুরু। তা কিন্তু মোটেই নয়। এই দেশের কথা আমরা অনেক অনেক বৎসর আগের পুরোনো ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা থেকে পাই।

যেখানে এখন সেণ্ট পিটারের ক্যাথিড্রেল আছে তার আশপাশেই দিগ্বিজয়ী রোমানরা বসবাস করত। তারা রাজত্ব করেছিল পাঁচ শ বছর।

এইখানেই চৌদ্দ শতক পর্যন্ত শক্তিশালী রাজা ও ততোধিক ক্ষমতাবান বিশপদের মধ্যে হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই।

একটা কথা আছে না, রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে আর নলখাগড়া পরাণে মরে। নিশ্চয়ই কত সাধারণ লোক তখন প্রাণ হারিয়েছে ও কত দুঃখ কষ্ট পেয়েছে।

কিন্তু সে কথা কোনদিন কোন ইতিহাসে লেখা থাকবে না ও থাকে না। সোনার অক্ষরে থাকবে লেখা অক্ষদের কথা। সোনায় মোড়া লোকেদের কথা। পৃথিবীর এই নিয়ম।

যখন রাজারা ও বিশপরা লড়তে ব্যস্ত বণিকরা চুপিসাড়ে ধীরে ধীরে ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিল। দেশেও প্রাচুর্যের শুরু হোল। লোকেরা পেল ঐশ্বর্যের স্বাদ।

সত্যি কথা বলতে কি রাজাদের ও বিশপদের মধ্যে যেন সাধারণ লোকেরা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই পনের শ ছত্রিশে জন ক্যালভিন যখন তাঁর নূতন ধর্ম প্রচার করতে এলেন লোকেরা তাঁকে দুহাত বাড়িয়ে সানন্দে গ্রহণ করল। উনিও ভালবেসে ফেললেন জেনিভাকে।

যদিও মানুষের জীবনের অনেক পার্থিব আনন্দ ছাঁটাই করে দিলেন। বললেন, "ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব অনাবশ্যক আনন্দ মানুষকে দেয় মানসিক অসুস্থতা। তাই এদের ত্যাগ করতে হবে।" লোকরা সাগ্রহে তাঁর বাণী গ্রহণ করল।

বিশপদের অত্যাচার এবং রাজাদের ও বিশপদের লড়াই এই দুটা থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। এখানেই ক্যালভিন রয়ে গেলেন। এখান থেকে তিনি নতুন আলো প্রচারকদের দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর টানে বড় বড় ফরাসী পণ্ডিতরা এখানে এসে বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান গড়ে তুললেন।

ধীরে ধীরে ফরাসী প্রটেস্টাণ্টরা দেশ ছেড়ে এদেশে পালিয়ে



মনটা খুশীতে ছেলেমানুষ বনে যায়

আসতে লাগল প্রাণে বাঁচার জন্য। এদের সাহায্যে এদেশে নূতন নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠতে লাগল।

এইভাবে এরা ঘড়ি-বানানোর বিদ্যায় পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে উঠল। গয়না বানানোর চারুশিল্পেও তাদের জুড়ি রইল না। এইভাবে দেশ হয়ে উঠল ঐশ্বর্যপূর্ণ।

কিন্তু এদের নূতন জীবনে টাকা খরচ করে আনন্দ করবার সব পথ বন্ধ। ফ্রেঞ্চ রাজাদের হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত এরা কপালের জোরে ঢুকে পড়ল সুইস কনফেডারেশনের মধ্যে। এতে ঢুকবার মুহূর্তটা এদের ছিল সত্যিকারের শুভ মুহূর্ত।

গ্রহগুলো সব নিশ্চয়ই ছিল সুউচ্চ ঘরে।

সেই থেকে এদের শুরু হোল জোর কদমে এগিয়ে চলা। শুধু চলা নয়। চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া, পৃথিবীতে একটা দেশ একটা জাতি যা চায় বা চাইতে পারে। সুখ শান্তি প্রাচুর্য।



আছে আনন্দ

যুদ্ধ নেই, বিগ্রহ নেই, অভাব নেই, অভিযোগ নেই, আছে আনন্দ।

লীগ অব নেশনের দপ্তর সব ওখানে শুরু হয় উনিশ শ বিশে। ইউরোপিয়ান ইউ. এন. হেড কোয়ার্টারও জেনিভাতে উনিশ শ ছেচল্লিশ সাল থেকে হয়।

এইসব বিরাট বিরাট অফিসের কল্যাণে অসংখ্য ডিপ্লোম্যাট সেক্রেটারী আন্তর্জাতিক ট্রানশ্লেটার, ইনটারপ্রেটার টাইপিস্ট স্টেনোগ্রাফার প্রভৃতিতে এই শহর ভরে গেছে।

এদের মাইনে আকাশছোঁয়া। তাই এদের আনন্দ করবার চাহিদাও অফুরন্ত। আমাদের তুলনায় মাইনে আর আহ্লাদ দুই-ই রূপকথার মত শোনায়।

জেনিভার রূপ এদের দৌলতে গেছে বদলে। আগের ধর্মভীরু শান্ত, বিষাদাচ্ছন্ন শহরটাকে কেউ আর চিনতে পারবে না। এ এখন প্রাণবন্ত, চঞ্চল, সুন্দরী তরুণী।

জেনিভাতে গিয়ে পৌঁছালাম সন্ধ্যা গড়িয়ে। এবার বাসস্থান ঠিক করতে একটু মাথা ঘামাতে হোল। প্রথমবার পরের ধনে পোদ্দারী। এবার ত বাবা ফুটো পকেট থেকে ঝেড়েঝুড়ে কানা কড়ি বের করা।

ফুটো পকেট এইজন্যই লিখলাম, মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেদের আর কত থাকে। তার উপর শখটা যদি হয় রাজসূয় যজ্ঞের।

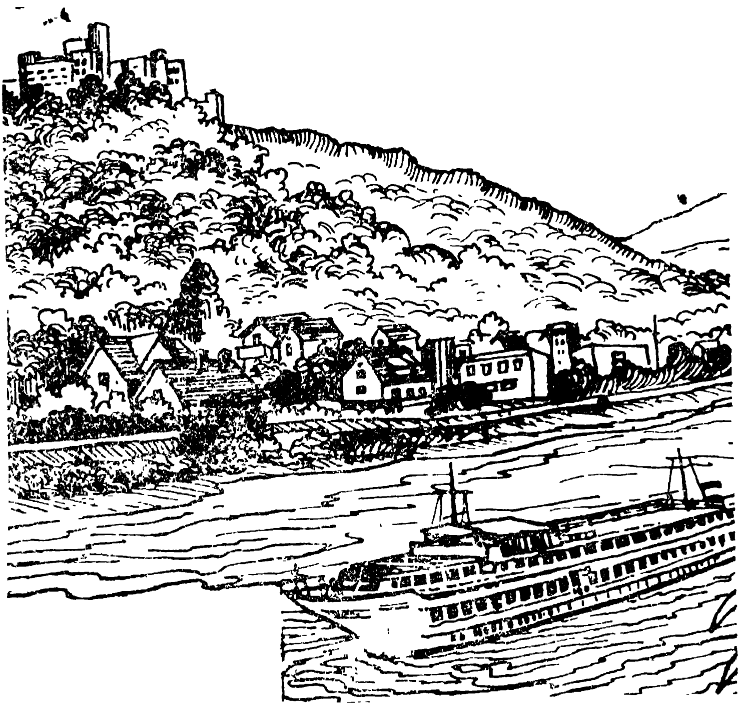
টুরিস্ট ব্যুরো থেকে আমাদের ঠিক করে দিল একটা মাঝারি হোটেলে। আমরা তিন রাত্রি বা তার বেশী থাকব বলে রেট্‌টা কমিয়ে পেনসনের রেট করে দিল। এদেশে এই নিয়মটা বড় সুন্দর। পেনসন, মানে অতিথিশালা।

জিনিস রেখে রাতের খাওয়া খেয়ে সোজা গিয়ে বসলাম লেক জেনিভার পারে। এদেশের প্রাণ মান ধন সবই হচ্ছে লেকটা, এই স্থলে ঘেরা সমুদ্রটা সত্যিই অপূর্ব।

একে ঘিরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত কবি, কত লেখক প্রাণের আবেগে রচনা করে গেছেন। একে দিয়ে গেছেন পূজার ডালি। সাজিয়েছেন রূপে রসে গন্ধে।

তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব কথাই মনে হচ্ছিল। কত ঘটনা, দুর্ঘটনা, আনন্দ, দুঃখের সাক্ষী হয়ে আছে এই হ্রদ। কোন শুভক্ষণে কোন প্রেমিক এরই জলের ছায়ায় দেখেছে তার প্রেমিকাকে। এখানে বসে মন জানাজানি হয়েছে। হয়েছে মনের আদান প্রদান।

আবার এখানেই কোন উদ্ধত যুবক এসেছে তার পুত্র কন্যা নিয়ে, আর সদম্ভে বলেছে এই করব, সেই করব। কিছুদিন পরে সেই এসেছে লাঠিতে ভর দিয়ে নিঃসঙ্গ।



সাজিয়েছেন রূপে রসে গন্ধে

কেউ কোথাও নেই। সঙ্গিনী চলে গেছে ওপারে। যাদের সব শক্তি দিয়ে মানুষ করেছিল তাদের ভাল লাগে না অতীতের সঙ্গ। কিন্তু লেক জেনিভা তার মমতা ভরা মন নিয়ে আনন্দেও সাথী, দুঃখেও সাথী।

পূর্ণতার সঙ্গী, শূন্যতারও সঙ্গী।

তাই মনে হোল, গতবারে অনেকটা অবহেলায়, সময় নেই সময় নেই বলে আড়চোখে দেখে গিয়েছিলাম। তখনও যেমন সস্নেহে কাছে বসতে হাতছানি দিয়েছিল, এবারও যখন সময় নিয়ে তোমার

কাছে এসেছি বলে স্থির হয়ে এসে বসলাম, তেমনি সস্নেহে যেন হাত ধরে বসাল।

মুখে কারো বেশী কথা ছিল না। বেশ অনেক রাতে আস্তে তিনজন উঠে নিজেদের আস্তানায় গেলাম ফিরে।

সকলে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে এক ইটালীয়ান মধ্যবয়সী দম্পতির সঙ্গে আলাপ জমে উঠল।

ওরা কিছুদিন আমেরিকাতে ছিল। সেই সুবাদে ইংরাজী ভাষাটা কিছুটা মক্স করেছিল। তারই রেশ টেনে এখনও বেশ চালাবার মত ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারে। বুঝতে ত ভালই পারে।

তাছাড়া আমাদের আছে, হাত পা নেড়ে, মুখ ভঙ্গি করে বোঝাবার ক্ষমতা।

আদিম যুগে যখন ভাষার সৃষ্টি হয়নি, তখনকার অভ্যেস মানুষের যুগ যুগান্তর ধরে গেঁথে রয়েছে।

সব মিলিয়ে আলাপটা ভালই জমে উঠেছিল।

"তোমরা কি এই প্রথম জেনিভাতে এসেছ?"

জবাবটা ভদ্রলোকই দিলেন, কারণ ইংরেজী ভাষার উপর তাঁরই দখল একটু বেশী। "জেনিভাতে আমরা প্রথম এসেছি। তবে জুরিখ আমাদের দেখা।"

আমাদের অবশ্য দ্বিতীয়বার কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেবার প্রায় না দেখেই চলে যেতে হয়েছিল। তাই ধরে নেওয়া যায়, আমাদেরও নূতন দেশে আসা।

"প্রথম কোনদিকে যাবে, ঠিক করছ?"

আমি বললাম, "ঠিক না করেই বেরুব ভাবছি। সবই অদেখা। যেদিকে পা এগুবে যাব সেইদিকেই।"

"বাঃ বড় সুন্দর করে বললে ত। তোমরা দেখছি একেবারেই আমেরিকান টুরিস্টদের মত নও।"

"কি রকম?"

"ওদের একেবারে ছকে আঁটা প্রোগ্রাম। কোনটার পরে কি

দেখবে। এমনকি, কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াবে। আমার ত মনে হয় কখন কোথায় কটা কথা বলবে তাও বোধহয় ঠিক করে রাখে আগে থেকে।"

ভদ্রমহিলা একটু হাসল।

আমি বললাম কখনো কখনো সত্যি গুণে গেঁথেই চলতে হয়। পয়সা গুণে, সময় গুণে। তবে এক এক সময় মনটা করে ওঠে বিদ্রোহ। মানুষের গড়া বাঁধাধরা জীবনের এত থেকে একটুখানি ছুটি চায়। মুহূর্তের জন্য হলেও। তাই না?"

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছ। তবে এখন আমরা ভাবছি প্রথম যাব আর্ট গ্যালারীতে। যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, চল না আমাদের সঙ্গে।"

মেয়ে আগ বাড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমরাও সেখানে যাব।"

সবাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়া গেল। পথে যেতে যেতে স্বামী-স্ত্রীতে যেন কি পরামর্শ হোল নিজেদের ভাষায়।

আচ্ছা আমাদের প্রোগ্রামটা একটু বদলালে কেমন হয়? ভদ্র-মহিলা বললেন।

"কি রকম?" আমি একটু এগিয়ে পড়েছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"কর্নাভাঁ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নোতরদাম চার্চে যাওয়া যাক।"

"বেশ ত।"

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে মনে হোল, তাই ত, এরা ত রোম্যান ক্যাথলিক। তাই ক্যাথলিক চার্চের কথা মনে এসেছে। যাত্রা শুরু করার আগ নমস্কার করে যাবে।

তখনই মনে হোল, মানুষ সবাই এক। শুধু বাইরের খোলসটাই আলাদা। আমরা যেমন কোথাও যাবার সময় দুর্গা দুর্গা বলে বের হই, এরাও তাই প্রথমেই চলেছে গির্জার দিকে। বাইরের শিক্ষা-

দীক্ষা ঐতিহ্য কালচার সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে অন্তরের অন্তর্যামীর ডাক।

স্টেশনে এসেও সেই একই কথা মনে হোল। এদেশের লোকেরা দেশটাকে শুধু বাসস্থান মনে করেন নি। এরা মনে করে এটা বাগান। নিজেদের।

আমাদের দেশে সরকার আর দেশের লোক মনে করে দেশ ত আছেই, দেশ ত থাকবেই, এ আর বেশী কথা কি।

আমাদের দেশে শুধু বাগানগুলো সাজিয়ে রাখতে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করা হয়। এরা পুরো দেশটাকেই বাগান মনে করে। স্টেশন দেখে মনে হোল এ শুধু আসা যাওয়া নামা ওঠার জায়গা নয়। এ হচ্ছে এক টুকরো নন্দনকানন।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

চার্চে ঢুকে মনে হোল পুরো দেশটা যখন রোম্যান ক্যাথলিক ছিল তখন না জানি কত গমগম করত। এখনও সুন্দরভাবেই রাখা। তবুও ত।

ওখান থেকে সোজা আমরা চলে গেলাম সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রালে। উঠলাম গিয়ে তার টাওয়ারে। ওপর থেকে শহর ও হ্রদ দুটো মিলে এমন এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা দেখে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের কথা মনে হচ্ছিল।

তাই মনে হচ্ছিল কত সাজিয়ে গুছিয়ে যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিশ্চয়ই একদিন ছাপিয়ে যাবে কাশ্মীর যেদিন মানুষের হাতের একটুকু ছোঁয়া লাগবে।

এর কাছেই সিটি হল। এইখানে আসবার কথা জেনিভাতে এসেই মনে হয়েছে—এটা তৈরী হয়েছিল পনের শতকে। সতের শতকে এটি অনেক বড় করে বানানো হয়।

সিটি হল চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে এর ভিতরের 'আলবামা' হলটার জন্য। এখানেই ষোলটা দেশের প্রতিনিধি একসঙ্গে হয়ে কনভেনশন অব জেনিভাতে স্বাক্ষর দিয়েছিল আঠার শ

চৌষট্টি সালে। এর ফলেই ইনটারন্যাশনাল রেডক্রস-এর জন্ম হয়।

এর উদ্যোক্তা বা জন্মদাতা হলেন হেনরী ডুনাণ্ট। এই ঐতিহাসিক ঘটনার আট বৎসর পরে আলবামা হলেই কোর্ট অব আরবিট্রেশন বসেছিল। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার মতান্তরে মীমাংসা হয়েছিল।

তাই মনে হচ্ছিল অসাধারণ মানুষ যেমন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে, অসাধারণ ঘটনা স্থলগুলিও প্রায় সেইরকম মানুষের মনের আনাচে কানাচে রয়ে যায়।

এখান থেকেই আমাদের ইটালিয়ান বন্ধুরা অন্য পথ ধরল। ওদের চেনা বন্ধুর বাড়ির সন্ধানে গেল।

আমাদেরও যেন মনে হচ্ছিল সদ্য চেনা মুখ ভাল লাগে। কিন্তু বোধ হয় বেশীক্ষণ নয়। যেমন নূতন দেশের মোহ কাটতে বেশীদিন লাগে না।

সেখানে থেকে চললাম ঘোরানো সরু পাথুরে গলি দিয়ে নতুন শহরের দিকে। যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটেই চলা হচ্ছিল। ঠিক যখন করেছি দিন তিনেক থাকব, তখন তাড়া নেই।

গলি দিয়ে যেতে খুব ভাল লাগছিল। এর ভেতরেই সত্যিকারের শহরের স্পন্দন পাওয়া যায়। চেনা যায় আসলকে। ক্যালভিনের নামে রাস্তা তৈরী হয়েছিল আঠার শতকে। এই রাস্তা ধরে যেতে যেতে তখনকার তৈরী বাড়িঘর ইত্যাদি থেকে সেদিনকার জীবনধারা স্থাপত্যের ধারার বেশ একটা ধারণা হলো।

জেনিভার সব চাইতে পুরোনো রাস্তা লে গ্রাদ রুতে-ও আমরা গেলাম। মনীষীশ্রেষ্ঠ রুসো এখানেই জন্মেছিলেন। বুর্গ দ্য ফোর হচ্ছে জেনিভার পুরোনো শহর, কলকাতার যেমন উত্তর কলকাতা, দিল্লীর যেমন পুরোনো দিল্লী।

এই জায়গাটাতে অনেক অনেক বৎসর আগে রোম্যানদের সময় গম আর গরুর বিকিকিনি হোত।

এরই কিছু দূরে ক্যালভিনের কলেজ। পনের শ উনষাটে উনিই প্রথম এটা স্থাপন করেন। এখন এটা জার্মান ছেলেদের গ্রামার স্কুল হয়েছে।

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে কখন যে বেলা গড়িয়ে প্রায় চা খাবার সময় হয়ে এসেছে তা বুঝতে পারিনি আমরা কেউ।

সত্যি, ভগবান অকৃপণ হাতে জোর করে ঢেলে দিয়েছিলেন সৌন্দর্যের উপকরণ এই দেশটার উপর। তাই ত একটা কথা আছে। সি সুইট্‌জারল্যাণ্ড অ্যান ডাই।

তবে এটা ঠিক, ভগবান একে শুধু অপরূপ করে তৈরী করেছেন। আর কোন দিকে তিনি কিন্তু তাঁর শক্ত মুঠি খোলেন নি। তাই এরা যা কিছু পেয়েছে খেটে নিতে হয়েছে। আয়েসে কিছুই হয়নি।

এদের চরিত্রের মধ্যে কতকগুলো সত্যিকারের গুণ আছে, যা তাদের এতখানি এগিয়ে এনেছে। এরা দূরদর্শী। ভবিষ্যতের চিন্তা করে এরা পা বাড়ায়। সাময়িক উত্তেজনায় কিছু এরা করে না। আমাদের মধ্যে যেটা অতি প্রবল।

সুপরিকল্পনা এদের রক্তের মধ্যে আছে মিশে। চট করে ওরা কখনও কোন কাজে হাত দেয় না। ভাল ভাবে প্ল্যান ক'রে করে। তাতে যদি একটু দেরি হয় হোক।

কিন্তু একবার যদি কোন কাজে হাত দেয়, সেটা মন দিয়ে খেটে তারা নিখুঁতভাবে তা শেষ করে।

আর দুটি ওদের চরিত্রে আছে, যা তাদের এই অবস্থায় আসতে সাহায্য করেছে : নিয়মানুবর্তিতা ও মিতব্যয়িতা।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট কাফে দেখে উনি কোন দিক না চেয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "খিদেতে যে পেট চনচন করছে। চোখে অন্ধকার দেখার জোগাড়। তোমরা দুজনে কি হাওয়া খেয়েই দিনটা কাটাবে ভেবেছ ?"

পিছন পিছন আমরাও গিয়ে ঢুকলাম।

"মা, তোমার আর মেনু দেখবার দরকার নেই। তুমি ত

স্বপনচারিণীর মত স্বপ্নরাজ্যে ঘুরছ। তখন থেকে লক্ষ্য করছি, কত কি যে ভেবে চলেছ। মুখে কথাটা নেই।"

"তা কথাটা অধিক বলিসনি। নূতন কোথাও গেলেই মনে হয় নিজের বিরাট দেশের কোন কোনটা যেন এর মত।"

ততক্ষণে খাবারের অর্ডার মেয়ে দিয়ে বসল স্কুবলিগের। এ হচ্ছে ওখানকার প্রসিদ্ধ সসেজ। মোটে একটা আনতে বলল আর দু পিস অ্যাপলটার্ট, আরও এটা সেটা।

"তুই যে একটা সসেজ অর্ডার দিলি? আমরা খাব না? আবার দু পিস অ্যাপলটার্ট শুধু তোদের দুজনের জন্য? ভাবিস না যে হাওয়া খেয়ে আমার পেট ভরা আছে।"

"ওমা! তুমি জান না বুঝি? এই সসেজের সাইজ এমন যে তিন জনেও খেয়ে শেষ করা মুশকিল। কিছু ভেব না আমি সব খোঁজ নিয়ে এসেছি। জান ত কুবেরের যক্ষপুরী হচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড।"

এই সসেজ খেতে এত সুস্বাদু যে স্বল্লাহারী ইংরেজরা লোভে পড়ে পুরোটা খেয়ে নেয়। ব্যাস্ তারপরই পেটটা হয়ে যায় গোলমেলে। অনেকে ফিরে এসে ভাবে জেনিভাবাসীরা ইংরেজদের পছন্দ করে না।

"কি বুদ্ধি, নিজে ভুল করে পরের ঘাড়ে চাপান।" আমি বলে উঠলাম।

এ ত দুনিয়ার নিয়ম।

"এখন ফিলসফি রেখে খাবারে মন দাও। ঐ দেখ সুগন্ধ ছড়িয়ে খাবার এসে গেল।"

অনুর কানে ওর বাবার কথা গেল কি না বোঝা গেল না। ও খাবারগুলো সবার প্লেটে ভাগ করে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এবার আমরা গেলাম কেনাকাটার মতলবে কেনা বেচার জায়গাতে। রু দ্যু রোন রু দ্যু মার্সে আর রু দি লা ক্রোশ দর হচ্ছে এখানকার রাসবিহারী এভেনিউ, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট বা

বৌবাজারের মত। অবশ্য অনেক পরিচ্ছন্ন অনেক সুন্দর। অনেক জমকালো, থরে থরে চোখ বাঁধানো জিনিস মন মজানো ভাবে সাজানো রয়েছে।

ঘড়ি আমরা প্রথমবারই কিনেছিলাম। তাই সেদিকে আর যাইনি।

তাছাড়া এখন আমাদের মন মেতে উঠেছে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষায়। জিনিস কিনে পয়সা নষ্ট ও বোঝা বাড়ানোর মতলবে আমরা নেই।

জেনিভা যদিও প্যারিসের মত অত প্রাণবন্ত নয়, তবুও প্রায় কাছাকাছি যায়। এখানে নাইট ক্লাবের ছড়াছড়ি। থিয়েটার কনসার্টও অসংখ্য।

আমরা কিন্তু কোথাও গেলাম না। এসব জায়গাতে যাওয়া মানেই থলি উপুড় করে আসা। তা তোলা রইল প্যারিসের জন্য।

ঝলমলে শহরে রাতের খাবার খেয়ে অনেক ঘুরে অনেক দেখে ফিরে এলাম হোটেলে। তাড়াহুড়ো করে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

কাল ভোর থেকে ত আবার ঘোরা আর দেখা, দেখা আর ঘোরা।

২

আজকের প্রভাতটা ছিল সত্যিই সুপ্রভাত।

খাবার টেবিলে আলাপ হয়ে গেল এক সুইস ভদ্রলোকের সঙ্গে। পূর্বপুরুষ ছিল ফরাসী। চেহারার মধ্যে সে ছাপটা বেশ রয়েছে। মাঝারি লম্বা নরম চেহারা, মিষ্টভাষী। এদের হাত পা মাথা নেড়ে কথা বলাটা ঠিক আমাদের মত।

ও জেনিভার লোক নয়, তাই হোটেলে উঠেছে ছুটি কাটাবার

"তোমাদের কোন ফিকস্‌ড্‌ প্রোগ্রাম নেই ত ?"

মেয়ে আর সে কি নিয়ে জানি বেশ জমে উঠেছিল। আমিই গল্প করছিলাম।



যদি একজনকে সঙ্গে নিই

"গতকাল জেনিভা শহরটা আমরা ঘুরে ঘুরে অনেকটা দেখেছি। আশ পাশটাই এখনও দেখা হয়নি।"

"ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে, মোটর আছে। আর একজনকে যদি সঙ্গে নেই, কোন আপত্তি আছে ?"

বারে, সে আবার কি কথা নিশ্চয়ই নাও।

আমরা কাছাকাছি বয়সী তিনজন। কিন্তু অনুর ত সঙ্গী চাই। এখানেই আলাপ হয়েছে একটা ছেলের সঙ্গে। ডাক্তারী পড়ে ওখানে। দুজনে জমবে ভাল।

"তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত?"

"না, একটুও না। সারা সকালটা আমার কিছু করবার ছিল না। দেড়টা থেকে আমার বন্ধু ও বান্ধবীর সঙ্গে প্রোগ্রাম রাত একটা দুটো পর্যন্ত। দুপুর একটা নাগাদ তোমাদের আবার এখানে নামিয়ে দেব।"

অনেক, অনেক ধন্যবাদ, উনি বলে উঠলেন।

তুমি ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করেছ, না?

হ্যাঁ, কেন বলত?

"তুমি ওদের কাছ থেকে ফরম্যালিটিটা বেশ মক্স করেছ। ওরা ত ভীষণ ফরম্যাল জাত। তোমার স্ত্রী কিন্তু খুব ইন্‌ফরম্যাল, ভারতবাসীদের কথা যা শুনেছি তাই। আমাদের মত।"

উনি বললেন, "ঠিকই বলেছ। আমি যখন বিলেতে ছাত্র ছিলাম তখন ইংরেজদের সব কিছুই শিখবার চেষ্টা করা হোত। ভাল হোক বা মন্দ হোক। এখন দিন পালটেছে। আমরা বন্ধু। আমরা বন্ধু। আমরা সমান সমান।"

আমরা তিনজনে সামনে বসলাম। অনু ও স্কচ ছেলেটা বসল পিছনে। গাড়ি ছুটল তীর বেগে কোপেটের দিকে। জেনিভা থেকে আট মাইল দূরে, অপূর্ব জায়গা।

এখানে একটি সুন্দর স্যাতো অর্থাৎ কেল্লার মত প্রাসাদ দেখলাম। প্রগতিশীল মাদাম দ্য স্ট্যালের স্যাতো। উনি ছিলেন বিরাট বড় ঘরের মেয়ে। যেমন সুন্দরী, তেমনি বিদুষী। নেপোলিয়ানের যুগে ওঁর যেমন প্রতিপত্তি তেমনি ছিল ঐশ্বর্যের জাঁকজমক।

অল্প বয়সে এড-ওয়ার্ড গিবনের প্রেমে পড়েছিলেন। এডওয়ার্ড তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই ধাক্কা তাঁর মনে এত আঘাত

করেছিল যে সঙ্গে সঙ্গেই উনি জেনিভার এক ব্যাঙ্কের মালিক জ্যাক নেকারকে বিয়ে করেন।

পরে নেকার ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হন। ফরাসী বিপ্লব হওয়ার সময় ওরা কপেটে এসে বসবাস করতে থাকেন। এই স্যাতোতে মাদাম কবি, সাহিত্যিক পণ্ডিতদের এক সভা বসান। যেমন রাজা চন্দ্রগুপ্তের ছিল নবরত্ন সভা। নয়টি পণ্ডিতকে নিয়ে। কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি। সেই রকম একটা ছোটখাট সংস্করণ ছিল মাদামের স্যাতোতে। যত গুণী জ্ঞানী এসে জমায়েত হোত তাঁর প্রাসাদে। যেমন বাইরন শ্লেগেল বেনজামিন কনস্টাণ্ট, সিসমণ্ডে, এডওয়ার্ড গিবন ও আরও অনেকে।

এই সব শুনে বড় ইচ্ছা করছিল স্যাতোর ভেতরটা দেখার। গিয়ে শোনা গেল সেদিন ভেতরটা দেখা যাবে না। মাদামের বংশধররা এখানে থাকে। তাই প্রতিদিন পাবলিক্‌কে দেখতে দেওয়া হয় না।

মনের দুঃখে আমরা নিয়ঁর-এর দিকে রওনা দিলাম। কপেট থেকে পাঁচ মাইল দূরে। জুলিয়াস সীজার পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্ট পূর্বে যুদ্ধের প্রধান সৈন্যদের জন্য এখানে ক্যাম্প তৈরী করেছিলেন।

এখানকার ভূতুড়ের মত দুর্গটা তৈরী করেছিলেন ভাড ক্যাণ্টনের প্রথম ব্যারন। এখন এইটা মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে কিছুটা, আর কিছুটা হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল অফিস। সেকালের ভূতুড়ে দুর্গ একালের অনেক কিছু।

এখানে আরও জানলাম পাহাড়ের কোণ ঘেঁষা ছোট শহরটা এক বিরাট কেনাবেচার বাজার। এখানে কি না পাওয়া যায়? মন যা চায় সব যেন উজাড় করে এই বাজারে ঢালা রয়েছে।

আমরা অবশ্য সেখানে দাঁড়াইনি। দূর থেকেই চোখকে তৃপ্তি দিয়েছি। ধরাছোঁয়ার মধ্যে গেলে কে জানে কোন ফাঁদে পড়ে যাব।

ফাঁদ যে পাতা সারা ভুবনে।

এই সব জ্ঞানের ভাণ্ডারের টুকিটাকি খবর যা আপনাদের বললাম, সবই দিচ্ছিলেন জেনিভিয়ান ভদ্রলোক। আর আমি ভরছিলাম আমার ঝুলি। মনে আশা এক সময় না এক সময় ঝুলি খুলে এসব আপনাদের বিলিয়ে দেব।



সেকালের ভূতুড়ে দুর্গ, একালের অনেক কিছু

"তোমরা বোধ হয় আসল কথাটাই এখনও শোনইনি।"

"কত কথাই ত শুনিনি। বিশেষ কোন্ কথাটা কানে ঢোকেনি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"সারা দুনিয়া আমাদের উপর অসন্তুষ্ট।"

"ওমা, কেন? তোমরা কার পিছনে কাঠি দিয়েছ।"

"পিছনে নয়, সামনে দিয়েছি। মানে, কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনি, কোন রাজত্ব গড়ে তুলিনি। তা সত্ত্বেও আমরা ঐশ্বর্যশালী সম্মানিত।"

"সে তো তোমরা নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তির জোরে দাঁড়িয়েছ। এমনকি তোমাদের কোন বড় বন্দরও ত নেই। তোমাদের সমুদ্র ত হচ্ছে ইনল্যাণ্ড—স্থলে ঘেরা সমুদ্র।"

"সেইখানেই ত মজা। এই পৃথিবীতে কেউ কারো ভালটা দেখতে পারে না। এমনি মজা যে আমাদের টাকা ফ্রাঙ্ক কারেন্সী হিসাবে পাউণ্ড স্টারলিং-এর চাইতে বেশী মূল্যবান। একমাত্র ডলারের সঙ্গে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।"

"হালই বা। কারও মরাইয়ে ত আগুন দাওনি। নিজেদের কপাল ও চেষ্টা দিয়ে দাঁড়িয়েছ।"

একটু চুপ করে থেকে সামনের বাঁকটা কাটিয়ে সে বলল, "কে তা ভাবে, আর কে তা বুঝতে চায়। আমরা সকলের কত উপকার করি। সারা দুনিয়াকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি, প্রতিবেশীদের ত করিই। আমাদের কি বলে জান? বুদ্ধিহীন, বোকা, আকর্ষণীয় নয়।"

ভদ্রলোকের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

"জান বন্ধু, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে। উপকারীকে বাঘে খায়। যে উপকার করে, সে ভাল হয়। সে একজন মানুষই হোক বা একটা সম্পূর্ণ জাতিই হোক, দুনিয়া তাদের পছন্দ করে না।"

পেছনের সিট থেকে হঠাৎ অমু বলে উঠল, "আমি তোমাদের সব কথা শুনছিলাম। তুমি জান না, আমাদের ছোট্ট বাংলাদেশে এক বিরাট মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। নাম বিদ্যাসাগর। এত জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন যে তার উপাধি হয়েছিল বিদ্যাসাগর। আবার

তিনি এত বড় দাতা ছিলেন যে তার মত উজাড় করে দেবার মত দাতা পৃথিবীতে বিরল। তাই তাঁর উপাধি হয়েছিল দয়ার সাগর। তিনিই একদিন যখন শুনলেন কে যেন তাঁর নিন্দা করছে, বলেছিলেন, আমি ত তার কোন উপকার করিনি। তবে কেন সে আমার নিন্দা করছে ?"

সত্যিই, এই ঘটনাটা শুনে আমার বড় ভাল লাগল। এ আমার মনের মধ্যে চিরকাল থাকবে।

নিয়ঁ থেকে বেরিয়ে বিদেশীকে বললাম, "এখন বোধহয় আমাদের ফেরা দরকার। তোমার বন্ধুদের কাছে যেতে দেরি হয়ে যাবে।"

"তার জন্য কোন চিন্তা নেই। জেনিভা ছাড়বার আগে ফোনে জানিয়ে দিয়েছি, অতিথিদের সবটা দেখিয়ে ফিরতে যদি একটু দেরি হয় ভেব না।"

"যাক বাঁচালে। একটু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। চল, কোথাও একটা সুবিধা মত জায়গাতে কফি ব্রেক করা যাক্।"

পেছনের সিট থেকে অনু ও স্কচ্ ছেলেটা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া।"

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে ফেলে আসা নিয়ঁর দিকে ছুটলেন। আধ মাইল ত মাত্র।

মার্কেট প্লেসের কাছে ছোট ছোট সুন্দর কাফের একটাতে পাঁচজন ঢুকে পড়লাম। অর্ডার দিলাম সালী অ ফ্রোমাজ, অর্থাৎ চীজ কেক, আর হোয়াইট ওয়াইন। নিজের ও মেয়ের জন্য বললাম কফি।

"এ আবার কি ? এক যাত্রায় পৃথক ফল ? তোমাদের কোন সুপারস্টিশন আছে না কি ?"

মেয়ে আগ বাড়িয়ে বলল, "কিছু না। আমাদের ত গরমের দেশ। তাই ওখানে খাওয়ার অভ্যাস নেই। মা, আমাদের জন্যও দাও।"

লেকের পারে আমাদের টেবিল লাগিয়ে দিল। কি ভাল যে

লাগছিল। এদের এই ধারণাটা বড় মন মুগ্ধকর। হ্রদের পারে বসে খাবার ব্যবস্থা।

"দেব না কি তাজা মাছের ফিলেটের অর্ডার ?"

"না, প্লিজ, ফিরে গিয়ে ত লাঞ্চ খেতে হবে। না হলে বন্ধু ও বান্ধবীরা ত মাথা ফাটাবে।"

"তা ঠিক।"

টাকা মিটিয়ে দিয়ে সবাই গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। পেটটা ভরা থাকাতে মনটাও ভরা।

"চল অবনের দিকে।"

এই বলে আমাদের পথে পাওয়া বন্ধুটি নিজের দেশ ও দেশবাসীর কথা বলতে আরম্ভ করল। আমরাও কান পেতে রইলাম জানবার আগ্রহে।

"আমরা অহংকার করতে পারি না আমরা একজাত বলে, এমন কি এক ভাষাভাষী বলে। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে একতার অভাব নেই, এর সবচাইতে বড় কারণ কি জান ?"

সে বলে চলল, "আমরা মন খুলে একে অন্যের দোষগুলো বুঝতে পারি ও নিন্দে করতে পারি। সুইস জার্মানরা সুইস ফ্রেঞ্চদের মন ছোট বলে মনে করি। ঠিক সেইরকমই এরা আবার ইটালিয়ানদের নিচু চোখে দেখে। আবার ইটালিয়ানরাও ঠিক সেইরকমই অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়। সেইরকমই একটা প্রদেশ অর্থাৎ ক্যান্টন আর একটাকে নিজের চাইতে খাটো ভাবে।"

লভ্ দাই নেবার বলে যে কথাটা আছে, সত্যিকারের সাংসারিক জীবনে বেশীর ভাগই খাটে না। যদি খাটত তবে ত পৃথিবী থাকত না, স্বর্গ হয়ে যেত।

এটা বোধহয় এদেশের লোকেরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। তাই এরা একে অন্যের নিন্দে চর্চা করে সাধারণ অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু আসল মৌলিক ব্যাপারে তারা এক। সেখানে কোন

মতদ্বৈত নেই। কোনটা আসল, কোনটা নকল, এটা বুঝবার ক্ষমতা আছে বলেই আজ সুইট্জারল্যাণ্ড সুইট্জারল্যাণ্ড।

গল্প করতে করতে কখন যে আমরা পৌঁছে গেছি অবনে তা টেরই পাইনি। আড্ডা এমনই জিনিস। তাই রকে বসে যারা আড্ডা দেয় সেই রকবাজ ছেলেদের বিরুদ্ধে অনেকেই বলে, কিন্তু আমি বোধহয় ঠিক মন খুলে বলতে পারি না। গল্প করাটা বেঁচে থাকার একটা মস্ত বড় টনিক।

ছেলেরা কি করবে? আমরা তাদের জন্য কোন খোলা জায়গা, পার্ক বা ক্লাব, কি করে দিয়েছি? তাই তারা রকে বসে গল্প করে।

অবন শহরটা মনে হোল অপরিবর্তনীয়। ষোল শতকেই যেন কি করে থেকে গেছে। স্থির হয়ে রয়ে গেছে একই জায়গাতে। পৃথিবী বিখ্যাত পরিব্রাজক ট্যার্ভানিয়ে বার শতকের একটা দুর্গ কিনেছিলেন। ইনি পারস্য ও তুরস্কে গিয়েছিলেন। তখনকার নবাব বাদশাদের দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাসের বিষয়ে অনেক কিছু লিখে গেছেন। সেই সব চমকপ্রদ বই এখনও পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

এই দুর্গটি দেখে মনে হচ্ছিল, তখনকার যুগে যারা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াত তারা সত্যিই নমস্য। কত কষ্ট তাদের করতে হয়েছে। এখন ত বলতে গেলে ফুস মন্তরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে লোকে চলে যাচ্ছে প্লেনে চড়ে।

এইখান থেকে আমরা চললাম ফিরে জেনিভার কেন্দ্রস্থলে মানে শহরের মধ্য জনিতে। ফিরতে সময়টা লাগল খুব কম। কোথাও মোটর থামে নি। চলেছে একটানা। একই পথ, একই দৃশ্য।

আমরা নেমে পড়লাম র‍্যু দ্য রোন রাস্তায়।

"তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে, আবার দেখা হবে। অ রিভোয়া।"

"তোমাকেও কোনদিন আমরা ভুলতে পারব না। তুমি হচ্ছ পথে পাওয়া এক টুকরো মণি। আবার দেখা হবে।"

হুস্ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। স্কচ্ ছেলেটা আর একটু দূরে গিয়ে নামবে।

সে বলল, "তোমার মনে হয় না, ভগবান আমাদের প্রতি কতখানি সদয়?"

"তা আর বলতে? পথে পাওয়া বন্ধু কত কিছু দেখিয়ে দিল। কত সময় ও পয়সার সাশ্রয় হোল।" মেয়ে উত্তর দিল।

আমি এ সব কথায় বড় একটা কান দিই নি। মনটা বাঁধা ছিল একই সুরে। এই বিশ্বের কিছুই ত জানি না।

এই জন্মে এক বিন্দুও কি জানব?

৩

ঘুম ভাঙার পরও যেন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না।

চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে আছি দেখে সে বলল, "হোল কি তোমার! সবার আগে সাত সকালে উঠে ত তুমি চরকি পাক করতে থাক। তাইত বলি আগের জন্মে নিশ্চয়ই তুমি স্পার্টাতে জন্মেছিলে।"

"আজ মনে হচ্ছে শরীরটা চলতে নারাজ, কিন্তু মনটা অতিমাত্রায় সচল। তাই ঠিক করেছি ব্রেকফাস্টের পরে হোটেলের লাইব্রেরী থেকে লুজানের বিষয়ে একটা বই নিয়ে বিছানায় টান টান হয়ে দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দেব।"

বাবা আর মেয়েতে গেল বেরিয়ে।

বইটা নিয়ে এসে খুলতে ইচ্ছে করল না। এই যে জানবার ইচ্ছা, অজানাকে জানবার ইচ্ছে, এটাই ত মানুষকে যুগ যুগ ধরে সজীব করে রেখেছে। না হলে ত আর দশটা জিনিসের মত সে হয়ে উঠত স্থবির।

পৃথিবীতে প্রথম যুগ থেকেই মানুষের মনে জেগেছে প্রশ্ন—

কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব! এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কবে যে পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই, কিন্তু মানুষ চিন্তা করে চলেছে বিশ্রামবিহীন। স্থির বিশ্বাস, একদিন সে জানবে।

সেদিন আমি কোথায়, কিভাবে থাকব জানি না। যে স্তরে পৌঁছেছি সেখানে, না আরও ওপরে। যেখানেই থাকি, আসল কথাটা জানতে যেন পাই, তা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

হঠাৎ দরজায় পড়ল টোকা। "এস" বলতেই মেড এসে এক কাপ ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল। মেয়ে বলে গেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পরে পরে যেন মাকে যে কোন একটা ড্রিংকস্ দেওয়া হয়। প্রথম অর্ডারটা তারই। পরেরটার জন্য মেড আমার দিকে তাকাল।

বাস্তবে এলাম ফিরে। মনে হোল মেয়েটা সত্যি লক্ষ্মী।

"তুমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অন্য কোন ড্রিংক দিয়ে যেও।"

ভারতবর্ষে আমরা যেমন বলি প্রদেশ, সুইট্জারল্যাণ্ডে বলে ক্যান্টন। ক্যান্টন ভদও লেক জেনিভার পারে। এর রাজধানী লুজান, যেখানে আজ যাবার কথা। এখানকার লোকেরা এই হ্রদটির একটি নিজস্ব নাম দিয়েছে, লেক লেমান।

এই নামটি অবশ্য বাইরের লোকে বড় একটা জানে না। হলে হবে কি, লুজানবাসীরা সদম্ভে বলে এই হ্রদ শুধু জেনিভার হবে কেন, এ ত আমাদেরও হ্রদ। কথাটা খুবই সত্যি। যে হ্রদ এতগুলো প্রদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে তাকে একটি প্রদেশের নাম দিলে তাকে ছোট করা হয়। আর তাছাড়া বাকি প্রদেশগুলোর অধিবাসীদের মনে ব্যথা দেওয়া হয়।

সেদিক দিয়ে বোধহয় আমাদের দেশ খুব সজাগ। যে জলধারা অনেক জনপদের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে তাকে কোন একটা প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেনি।

এদেশের লোকেরা নিজের দেশ সম্বন্ধে খুব সজাগ এটা বুঝতে পারলাম তাদের একটি স্লোগান জেনে, "সুইট্জারল্যাণ্ডের ভাবীকালের শহর।"

ইস্, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম একটি ধ্বনি, স্লোগান কেউ বের করতে পারে না, যাতে আছে প্রাণের স্পন্দন, আছে দেশপ্রীতি, আছে কিছু করবার উদ্দীপনা ?

লুজ্যানের ইতিহাস জেনিভার মত ততটা চমকপ্রদ না হলেও একেবারে ফেল্‌না নয়। এটা যে কত পুরোনো জায়গা তার প্রমাণ দিয়েছে এখানে পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কাল।

জুলিয়াস সীজার এইখানে একটি সৈন্যদের ক্যাম্প বসিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে দুর্ধর্ষ দস্যুর দল এসে শহরটিকে ভেঙেচুরে লুটে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। দেশের লোকেরা তখন পাহাড়ের চূড়াতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই হোল লুজ্যান শহরের শুরু।

হ্রদের পাশে পাহাড়ের মাথার উপর এই শহরটি আস্তে আস্তে বেড়ে উঠতে থাকে।

সর্বসাধারণরা ত আসেই, আসে বিশপরা, আসে ব্যবসায়ীরা। ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্টের দৃষ্টি এদিকে পড়ে। তাঁর চেষ্টায় ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ফ্লেমিশ নৃপতিরা একটি অপূর্ব সুন্দর ক্যাথিড্রাল গড়ে তোলে। এক গথিক স্টাইলের ক্যাথিড্রালের দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য পোপ দশম জর্জ নিজে আসেন। এখানেই রুডল্‌ফ অব হ্যাপস্‌বার্গ তাঁর রাণী ও সবকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আসেন ও তাঁর অভিষেক এই গির্জাতে হয়। সেই থেকে তিনি হলেন জার্মানীর সম্রাট এবং হোলী রোমান এম্‌পায়ারের সম্রাট।

এইভাবে নোতর দাম ক্যাথিড্রাল একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। গির্জাটি ঘিরে ধীরে ধীরে এই সমৃদ্ধ শহর গড়ে ওঠে।

বিশপরা নিজেদের থাকার যোগ্য প্রাসাদ সব গড়ে তোলে। বণিকরা করে তাদের বাসস্থান, সাধারণেরা সাধারণ বসবাসের ব্যবস্থা।

লুজ্যানের আশপাশ রাজার অধিকারে গেলেও লুজ্যান কিন্তু রয়ে গেল বিশপদের অধিকারে।

এই পর্যন্ত জানা হয়েছে কি দরজায় অতি মৃদু মধুর টোকা পড়ল।

ওঃ। বুঝেছি। মেয়ে যে বন্দোবস্ত করে গেছে যে মাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু ড্রিংকস্ যেন দিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এমন একটি দেশে এসে কে আর চায় ড্রিংকস্!

আমি ত পান রসিক নই যে জেনিভা লেকের এপারের ক্ষেতের আঙুরের আর ওপারের বেশী রোদ পোয়ানো রোদে পাকানো আঙুরের রসের তৈরী সুইস ড্রিংকসের তফাত বুঝতে পারব অথবা তাই নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে মহা কনোইস্যরের মত জ্ঞান ছাড়ব।

আর কোকা কোলা বা পাইন অ্যাপল জুস ত সব দেশেই একরকম।

তার চেয়ে বরং আসুক গরম এককাপ শোকোলা।

অর্থাৎ আমরা সাদামাঠা উচ্চারণে ইংরেজীতে যাকে বলি চকোলেট। গরম আর তরল আর খয়েরী রঙের পানীয়। তার স্বাদ আর সৌরভ দুই-ই আলাদা।

আশ্চর্য! এসেছে ঠিক তাই।

এরা, মানে সুইস হোটেলের কর্তৃপক্ষরা একেবারে অন্তর্যামী। কোন ভিজিটার, কোন ক্ষণিকের বাসিন্দা কিসে যে খুশি হবে তা যেন জ্যোতিষের ছক কেটে ধরে নিতে পারে। সাধে কি আর দুনিয়া ভর সুইস হোটেলিয়ারের সুনাম।

শুধু তাতেই শেষ নয়।

শোকোলার সঙ্গে কয়েকটি চকোলেট লিকোরিস। ছোট ছোট চকোলেটের টুকরো। প্রত্যেকটির বাইরে জমকাল ঝকমকে নানা রঙে আঁকা রাংতায় মোড়া। আর ভেতরে বিন্দু বিন্দু চেরী ব্র্যাণ্ডি, বা শেরী বা অন্য কোন তরল সুরায় ভরা।

এ যে একেবারে জলভরা তালশাঁস সন্দেশের সুইস সংস্করণ হয়ে গেল।

তফাতের মধ্যে এই যে চকোলেট মোণ্ডাগুলির স্বাদ প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন।

বৈচিত্র্যে আর বিস্ময়ে।

এ যে একেবারে রূপকথা হয়ে গেল। আর আমিও যেন সেই রূপকথার দেশে অতিথি। হোটেলের কর্তৃপক্ষ বিদেশিনীর প্রতি কমপ্লিমেণ্টস্ পাঠিয়েছে এই সঙ্গে। মনকে নাড়া দেওয়ার মত এই আতিথ্য কি একা একা ভোগ করতে ভাল লাগে!

সত্যি। এরা আতিথ্যকে রাজসিক করে তুলবার আর্টটা খুব ভাল করেই জানে। একেবারে চারুশিল্প যাকে বলে।

এই ধরুন না কেন, সামান্য একটা উদাহরণ। সিমোলিনা মুসে। কি কি জিনিস দিয়ে আর কেমন করে বানায় তা জানলে মনে হবে মিঠাইটা অতি সাধারণ। কিন্তু আসলে এটা সুইস ত!

ময়দা ভাল করে চেলে নিলে যে মোটা দানাগুলো পড়ে থাকে তার নামটাও বড় কাব্যমাখা, সিমোলিনা। সেই বস্তুটি ডিম দুধ ঘন ক্রিম চিনি লেবুর খোসা আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে বানিয়ে জমিয়ে নিন। যখন মুখে দেবেন তখন সেটা একা ভোগ করতে মন চাইবে না।

মনের খুশীর কথাটা লিখতে লাগল এত সময়। কিন্তু ভাবতে লেগেছিল এক নিমেষ। মেডকে ধন্যবাদ দিতে না দিতেই দরজায় আবার টোকা। বুঝলাম ওরা ফিরে এসেছে।

"আয় বাবি।"

বলতেই দুজনে এসে ঘরে ঢুকল।

"তুমি এখনও বই পড়ছ! জিনিসপত্তর গোছাওনি! আমাদের ত জেনিভা ছাড়ার ঘণ্টা বেজে গেছে।"

"বাবা, তুমি এত ঘাবড়াও কেন? অঢেল সময় ত হাতে, আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছি। মা, রেডি হয়ে পড়।"

"আমরা প্রথম জিনিসগুলো স্টেশনের লকারে রেখে বেরিয়ে পড়ব মাকে নিয়ে জেনিভাকে এবারকার মত শেষ দেখা দেখতে। সেটা অবশ্য হবে লেকের পাড়ে লাঞ্চ খেয়ে, কি বল?"

আমরা দুজনেই এক কথায় রাজী।

হোটেলের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে চললাম তিনজনে স্টেশনের দিকে। ওখানে জিনিস রেখে, লেকের পাড়ের একটা কাফেতে গিয়ে বসলাম।

জেনিভাতে এসেই এই হ্রদের পাড়ে এসে বসেছিলাম, আবার ছেড়ে যাবার সময়ও এসে বসলাম এখানে।

এই শহরটা ঘুরে ফিরে দেখে শেষ পর্যন্ত মনে হোল, যদি আবার আসি, তবে এই লেকের টানেই আসব। বোধ হয় সবাই তাই আসে।

ধীরে সুস্থে খেয়ে চললাম তিনজনে স্টেশনের দিকে। সোজা পথে নয়, ঘোরানো পথ। যতটুকু দেখা যায়, তাই লাভ।

ট্রেনে উঠে মনে হোল, বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে গিয়ে। আর একটু বেশী সময় নিলে কি ক্ষতি ছিল। পঁয়ত্রিশ মিনিট ত নিমেষে কেটে যাবে।

সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় না করে জানালা দিয়ে বাইরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চেষ্টা করছিলাম।

লুজানে পৌঁছেই রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই দক্ষিণ দিকের একটি মাঝারি রকমের হোটেলে উঠলাম। নামটি মিষ্টি, হোটেল দ্যু বুলেভার্দ। হোটেলের ঘরটি ভাল লাগল। জিনিস নামিয়ে একটু বসেছি কি দরজায় পড়ল টোকা।

দরজা খুলতেই দেখা গেল দুটি সুইস ছেলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ে এগিয়ে গেল।

"খবর নিয়ে এলাম। বার্নের ছেলে এরা, একরাত কাটাতে এসেছে। পাশের ঘরে থাকবে, কাল সকালে জেনিভাতে চলে যাবে। ভুল করে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছিল। ওরা বেশ ইংরেজী জানে। আমি কিন্তু ওদের আমাদের সঙ্গে খেতে বলে এসেছি।"

"ওরা এখানকার সব জানেও না। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাবার অবস্থা হবে।"

"মোটেই না, ওরা শে গোদিয়ে বলে ছোট রেস্টুরেন্টের নাম করল। দামে সুলভ ও স্বাদের খাবারও পাওয়া যায়। আমি কিন্তু একটু জুতো খুলে বিছানাতে গড়িয়ে নি।"

"ঠিক বলেছিস্। আমিও আরামসে বসে বসে এই দেশটির খবর যা জেনেছি সব তোদের বলব, বই পড়ে অবশ্য।

"একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার জন্য এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আসি।"

"বাবা ত বেশ। শুধু নিজের জন্য বলতে চলেছে। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি।"

"আমি শুধু দেখতে চাইছিলাম মা আর মেয়ের মতিগতি। আমি ত সবার জন্যই দিতাম।"

কফি নিয়ে তিনজনে আরামসে আধা শুয়ে গল্প আরম্ভ হোল। মানে বক্তিয়ার খিলজি আমি একা, আর সবাই নীরব শ্রোতা। যা কিছু পড়েছিলাম সব দিলাম উজাড় করে ঢেলে।

"ভাগ্যিস আজ সকালে তুমি অযথা এলোমেলো না ঘুরে বইটা পড়েছিলে। তাই এত সব জানলে ও জানালে।" সে বলল।

"রাতে খেতে খেতে ছেলে দুটির কাছ থেকে কিছু যদি আরো জানতে পারি, খুব ভাল হবে তাই না।"

"ঠিক বলেছ মা, আমরা একটু চুপচাপ থাকব। তুমিই টোপ ফেলে জানবার চেষ্টা কোর।"

"আরে, গল্প করতে করতে যে বাইরে যাবার সময় হয়ে এসেছে। ছেলে দুটি ত এখনই এসে হাজির হবে।"

সবাই তাড়াহুড়ো করে পোশাক বদ্‌লে তৈরী হতে না হতে দরজায় পড়ল টোকা।

পাঁচজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। মনের মত কম দামী ভাল খাবারের রেস্টুরেন্টের দিকে। ছেলে দুটিই অর্ডার দিল আর আমি দিলাম টাকা। কম খরচে পাঁচজনে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হোল।

ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল। এখানেও বিশপদের সঙ্গে সাধারণ লোকেদের লড়াই লেগে যায়। এসব শুনে মনে হচ্ছিল তখনকার দিনের বিশপরা নামেই বিশপ ছিল। কার্যত তারা ছিল ঘোরতর সংসারী।

পনের শ ছত্রিশ শতকের আগস্ট মাসে সিটি কাউনসিল নূতন ধর্ম গ্রহণ করল। ক্যাথলিক চার্চের সব ধনদৌলত দেশের তোষাখানায় রক্ষিত হোল।

আঠার শতকে লুজানের সামাজিক জীবনের মান বেশ উন্নত হোল। এখানকার বনেদী জমিদাররা বড়লোক ইংরেজদের সাদরে গ্রহণ করল।

স্থানীয় বনেদী লোকেরা এডোয়ার্ড গিবন, লর্ড নর্দাম্বারল্যাণ্ড, ভল্টেয়ার ইত্যাদি মনীষীদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা রকম উৎসবের ব্যবসা করত। থিয়েটার পার্টি. পিকনিক।

এর কিছুদিন পরেই ভদ প্রদেশ বার্নের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। ফেডোরক সীজার ঢাসা হার্প হলেন নেতা। বার্ণিজদের দিলেন তাড়িয়ে। চার বৎসর ঝগড়াঝাটি চলার পর নেপোলিয়ান এর মীমাংসা করেন। ভদকে হেলভেটিক কনফেডারেশানের মেম্বার করে দেন। স্বাধীন হবার পর থেকেই এখানকার লোকেরা দেশটাকে মনে প্রাণে গড়ে তুলতে আরম্ভ করে। সেই প্রচেষ্টারই ফল হচ্ছে আজকের লুজান।

৪

সকালে উঠে পথের ধারের একটি ছোট পরিচ্ছন্ন কাফেতে প্রাতরাশ সেরেই জোর কদমে বেরিয়ে পড়া গেল নোতর দাম চার্চের দিকে।

পুরোনো শহর বলে কিছুই বিশেষ নেই। এরা সত্যিই দেশটাকে ওলটপালট করে দিয়েছে। কোথায় সেই বইএ পড়া সরু সরু

গলি, কোথায় সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। শুধু চার্চের চারপাশে পুরোনো শহরের একটুখানি রেখে দিয়েছে যেন দেখাবার জন্য কি ছিল, কি হয়েছে। বুরগানডিয়ান গথিক স্টাইলে বানানো এই চার্চটা সত্যিই একটা দ্রষ্টব্য। সেন্ট মেয়ারের দুর্গটা দেখলাম। আগে এটা ছিল বিশপের প্রাসাদ।

বার্নের লোকেরা যে এক সময়ে বেশ সদম্ভে ছিল তা তাদের সতের শতকের স্টাইলের সিটি হল দেখলে বোঝা যায়।

ওখান থেকে একটা আধা দিনের সফর নিয়ে চলে গেলাম "উশী" এলাকায়। এটা হচ্ছে সুন্দর ছোট একটা গ্রীষ্মাবাস। এখানে একটা লেক বন্দর আছে। চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরা বাগান। ঘুরে ঘুরে দেখতে বড় ভাল লাগছিল।

দিল্লির কথা মনে করিয়ে দেয় আর দেয় শিলং-এর কথা।

উশী পৃথিবীর মধ্যে বেশ একটা নাম করে নিয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় কটি বড় বড় কনফারেন্স এখানে বসেছিল। আরব ইজরায়েল পিস্ কনফারেন্স ও উনিশ শ উনপঞ্চাশ সালে এখানে হয়।

ওখান থেকে সোজা চলে গেলাম সভারেলাঁতে। বিশেষ করে পার্ক ও হ্রদের ধারে রেস্টুরেন্টে খাবার জন্য। একটা রেস্টুরেন্টে খাবার জন্য আমরা বোধ হয় এলোমেলোভাবে কখনও ঘুরিনি। এখানে কিন্তু খাওয়াটা সত্যিই উপভোগ করলাম।

বসে বসে ভাবছিলাম, সত্যি সুইট্জারল্যাণ্ডের লোকেরা যে প্রথম থেকেই অনেক চেষ্টা ও কষ্টে বড় হয়েছে সেটা খুব বোঝা যায় তাদের মানসিক চিন্তাধারা থেকে। তারা স্বপ্নলোকে বিচরণ করে না। তারা আকাশে ওড়ে না, মাটিতে পা ফেলে চলে।

এরা বাস্তববাদী ও বিচক্ষণ। অল্প বয়সেই এদের কাজে ঢুকতে হয়। ছোটবেলা থেকেই এদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়, 'Life is earnest.'

পনের ষোল বছর বয়সেই এদের স্কুল জীবন শেষ হয়। তার

পরই ছেলে মেয়ে, দুজনকেই তিন চার বছরের জন্য শিক্ষানবিশী করতে হয়। বাবার ব্যবসা থাকলে তাতে বা অন্য কোথাও।

একটা দিক দিকে সুইসরা ভারতবাসীদের মত। তারা চায় নিরাপদ, নিশ্চিন্ত জীবন। আমাদের মত অল্পে সন্তুষ্ট। তাই আমাদের মত তারাও সরকারী চাকরির ভক্ত। পাঁচজনের মধ্যে একজন হচ্ছে সরকারী চাকুরে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমক ভাঙল। তাইত, এখনই ওঠা দরকার। এর দিকে তাকিয়ে দেখি লেকের পারে বসে বসে চোখে ঢুল নেমেছে। মেয়ে জলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে। কে জানে, জলের মধ্যে কি দেখতে চেষ্টা করছে। তার ভবিষ্যৎ?

"চল, এবার সবাই ওঠা যাক। আরও অনেক কিছু দেখা বাকি।"

উশী বন্দর থেকে স্টীমারে করে আমরা আধা ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাঁ সুলপিসে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যত রোমানেস্ক গির্জা আছে, এখানকারটাই সব চাইতে যত্নে রক্ষিত। এটা এগার শতকের। বুরগ্যাণ্ডির সন্ন্যাসীরা এটা বানিয়েছিল।

গোল গোল খিলান, বিরাট সব স্তম্ভ আর প্রকাণ্ড ভল্ট অর্থাৎ গর্ভগৃহ এমনভাবে সাজানো যে সবকিছুই বেশ সুন্দর মানানসই ভাবে মিলে গেছে। এটাই রোমানেস্ক স্টাইলের আর্ট।

ওখান থেকেই আমরা লুজান শহরের দিকে ফিরে চললাম।

কেনা কাটার মাঝখানে আলোতে ঝলমলে পরিবেশে এসে কেন জানি মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠল। পুরোনো জিনিস মন টানে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। এই বোধ হয় মানুষের স্বভাব। সে চায় তার স্বাভাবিক পরিচিত পরিবেশ

রু দ্য ব্যুর্গ ও রু সাঁ ফ্রাসোয়া হচ্ছে দুটা বড় রাস্তা, যাতে আছে সব বিরাট বিরাট দোকান। দামী নিখুঁত জিনিসে ভরা। সে সব দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এখানে লুজানের নিজস্ব জিনিস বলে প্রসিদ্ধ বিশেষ কিছু স্থানীয় জিনিস নেই।

একটা জিনিস চোখে পড়বার মত। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ থেকে এখানে শুরু হয় শহর গড়ার এক কর্মযজ্ঞ। পুরোনো বাড়ি, পুরোনো কোয়ার্টার ভেঙে পরিষ্কার করে প্রশস্ত রাস্তা, ঝকঝকে বাড়ি, ঘর, অফিস, অ্যাপার্টমেন্ট ইত্যাদি গড়ে তুলেছে, শহরতলিতে সুন্দর করে বানানো হয়েছে ও হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর বাগান বাড়ি নিখুঁতভাবে প্ল্যান মাফিক তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে। এলোমেলো ভাবে নয়।

সতের তলা, পনের তলা আকাশ ছোঁয়া বাড়িও রয়েছে এমন ভাবে যাতে সৌন্দর্যের কোন হানি হয়নি।

"একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস্, অমু, কলেজে পড়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশ আছে।"

"বারে, হবে না? জান না বুঝি, এখানকার ইউনিভার্সিটির খুব সুনাম, স্কুলগুলোও ভাল। এখানকার স্ট্যাণ্ডার্ড বেশ উঁচু। তাই বাইরে থেকেও ছেলেমেয়েরা আসে এখানে পড়তে।"

ঘুরতে ঘুরতে যখন বেশ অনেকটা রাতে হোটেলে ফিরে এলাম কারও মুখে বিশেষ কথা নেই। সেই শক্তিটা যেন চলার পথে ফেলে আসা হয়েছে কাপড় এলোমেলো করে ফেলে যে যার বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। সকালে উঠতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। ঘুমিয়ে সময়টা চলে গেল বলে মনটা সেদিন বেশ খারাপ হয়েছিল।

এখন মনে হয়, দেশ দেখাটা কি আর এমন বড় জিনিস? তার থেকে কয়েক ঘণ্টা কাটা গেল বলে দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু আবার ভাবি সারাটা জীবনই ত কত অযথা সময় নষ্ট করেছি। সেই সব মূল্যবান সময়গুলির কিছুটাও যদি বাঁচাতে পারতাম।

সেই মুহূর্তে দুটি লাইন দেয় মনকে সান্ত্বনা :

"তোমার মহাবিশ্বে
কিছু হারায় নাক কভু"

সকালে খাওয়া সেরেই রওনা হলাম তের মাইল দূরের লা সারাজ নামে একটা জায়গার উদ্দেশ্যে। কোচে করে সেইদিকে যেতে যেতেই দুধারে নাম না জানা কেল্লা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই

জায়গার নামকরণই বোধ হয় হয়েছে একটা দুর্গের নামে। উল্টোটাও হতে পারে। জায়গার নামে দুর্গ। সঠিক জানি না। তবে জায়গাটার ও দুর্গটার নাম একই।

এই দুর্গটি একটি শিলাখণ্ডের উপর। বুর্গাণ্ডীর রাজারা এটা বানিয়েছিলেন এক হাজার উনপঞ্চাশে। অনেক বৎসর পরে, বলতে গেলে প্রায় তের শতকে আবার এটা নূতন করে বানানো হয়। চোদ্দ শ পঁচাত্তরের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে এই দুর্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই এটা সারিয়ে তোলে।

আমাদের মত উদাসীন নয় ওরা। যা যাচ্ছে, তা যদি অমূল্যও হয়, তাকে আমরা যেতে দিই। এরা কিন্তু মূল্যহীন জিনিসকে যেমন সময় নষ্ট না করে ভেঙে গুঁড়িয়ে সে জায়গা সুন্দর করে গড়ে তোলে, ঠিক সেই রকমই অমূল্যকে তারা মূল্য দিতে জানে। তাকে তারা সযত্নে শুধু যে রক্ষা করে তা নয়, তার পারিপার্শ্বিকও তারা মনোরম করে তোলে।

তাই লা সারাজ দুর্গটি এখন ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। এই দুর্গের শেষ মালিক আঁরি অ্য মস্রোৎ উনিশ শ বিশে ভদ প্রদেশকে দান করে। এটা এখন নানা যুগের ফার্নিচারের মিউজিয়াম হয়েছে।

এখান থেকে এক মাইল দূরে পম্পাপল্‌স্‌ নামে একটা ছোট গ্রাম আছে। গ্রামটার বিষয়ে একটা আজব কথা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থল হচ্ছে এই গ্রামটা। কি করে কবে কাকে দিয়ে চালু হয়েছিল কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু এখনও এই ধারণা বা কথা বেশ প্রচলিত। ওখানে না গেলেও কানে ঠিক এসে গিয়েছিল।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মত দেখলাম রূপকথার কাহিনী এই শহরটাকে ছেয়ে আছে। লা সারাজ থেকে পাঁচ মাইল দূরে অব্‌ বলে একটা জায়গাতে গিয়ে শুনলাম বুর্গাণ্ডির নিষ্ঠুর রানী ক্রুন্‌হিল্‌ডা সাত শতকে এখানে রাজত্ব করেছিলেন। ওখানকার আঠার শতকের একটা টাউন হল দূর থেকে দেখলাম। নানা ইতিহাস বা উপকথা

জড়িত দ্রষ্টব্য দেখার পর কি আর আধুনিক যুগের চাঁছাছোলা জিনিসে মন ভরে ?

তাছাড়া শরীরে সব চাইতে বড় চাহিদা জানান দিচ্ছিল। এর জন্যই ত যুগ যুগ ধরে লোকে ভালবাসার জন ছেড়ে দেশ দেশান্তরে চলে গেছে। তাকে ত অবহেলা করবার শক্তি সাধারণ জীবের নেই।

তাই গুটি গুটি ফিরে চললাম শহরের দিকে। এখানে খাবার জায়গা ত আছে। কিন্তু হোটেলওয়ালারা ছুরি শানিয়ে বসে আছে। বেঁচে থাক ছেলেদের দেখানো সস্তা কাফেটা।

লুজান রাজারাজড়ার শহর বলে প্রসিদ্ধ। এখানে রাজ্যহারা অনেক রাজা রানী, রাজকুমার রাজকুমারীরা বাস করে। অথচ এখানকার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে সত্যিকারের এখানকার নামী লোক যারা, তারা কৃষকদের বংশধর।

জেনিভা ও আরও অনেক সব শহরে যেমন রাজবংশীয়দের মর্যাদা বেশী, এখানে ঠিক উল্টো। জোতদারদের বা আঙুরক্ষেতের মালিকদের বংশধরদের মর্যাদা বেশী। সেদিক দিয়ে মনে হয় জেনিভার চাইতে লুজান অনেক বেশী ডেমোক্র্যাটিক্।

সত্যি কথা বলতে কি, এই মানসিক ধারাটা এত বেশী ভাসা ভাসা যে তা একেবারেই মনের ভিতরটাকে স্পর্শ করেনি। তাই সব প্রদেশের লোকেরই মানসিক ধারা এক।

এই ভাবেই ত আস্তে আস্তে এই বিশাল পৃথিবী ছোটর থেকে ছোট হতে চলেছে।

৫

দুপুরের খাওয়া সেরেই হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে লুজানকে মিষ্টি হেসে হাত নেড়ে পা বাড়ালাম ভিভির দিকে।

পথে থামলাম লাভ্যো নামে একটা সুন্দর আঙুরক্ষেতে ভরা

জায়গাতে। এখানে শুনলাম কৃষকরা সব কাজই হাতে করে। মেশিনের কোন কারবার নেই। পোকামাকড় থেকে বাঁচানো, সার দেওয়া, সবই হাত দিয়ে করে। এমন কি পিঠে করে মানুষরা মাটি নিয়ে আসে, মাটি খোঁড়ে। যাবতীয় কাজ! ঠিক আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতখামারে যা হয়।

আশ্বিন মাস হচ্ছে ওদের ফসল কাটবার সময়। মেয়েরা তোলে আঙুর। ছেলেরা তা ঝুড়ি করে উঁচু থেকে নিচে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেয়।

লাভ্যোর আঙুর মদ তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধ। তাই এদের চাহিদাও খুব।

তারপরই আমরা রওনা হলাম ভিভির দিকে। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার নেশা যাদের আছে তাদের কাছে মন্ত্রোর মত ভিভিও পরিচিত। ভিভিতে পৌঁছে ছোটমোট একটা অতিথিশালায় গিয়ে উঠলাম। একটা রাতের ত মাত্র কারবার।

ঝুপঝাপ করে জিনিস নামিয়ে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম নেস্‌ল চকোলেট ও জমানো দুধের কারখানার দিকে। বিশ্ববিখ্যাত নেস্‌ল কোম্পানীর হেড্ কোয়ার্টার এইখানে।

ভিভিতে যাবার যদি বলি সব চাইতে বড় আকর্ষণ হচ্ছে নেস্‌লের হেড কোয়ার্টারে যাওয়া? অনেকেই বোধ হয় মুখ টিপে হাসবে। কিন্তু কানে কানে যদি বলবার সুযোগ হয়, তবে দেখা যাবে নেস্‌লস্ চকোলেট সকলেই দারুণ ভালবাসে। শুধু ছোট বেলাতে নয়, বড় বয়সেও।

আমি না হয় হাটে হাঁড়ি ভাঙলাম। এমন কি, আমার আদরের কুকুর ভিকি যখন মাস দুয়েকের তখন প্রথম ওকে চকোলেট খেতে দিই। সেই দৃশ্যটার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ওর চোখে যে কি আনন্দ ও তৃপ্তির ভাষা ফুটে উঠেছিল, তা প্রকাশ করা সত্যিই শক্ত। তারপর ও আনন্দে যেন নেচে বেড়াতে লাগল।

তখন মনে হয়েছিল, আমি যদি আঁকতে পারতাম ত এই অপরূপ দৃশ্য তুলির আঁচড়ে চিরকালের করে রাখতাম।

এখানে এসে বারে বারে ওর কথা মনে হচ্ছিল। ও আর এই পৃথিবীতে নেই। থাকলে কি আর আজ আমি ওকে ফেলে আসতে পারতাম?

এই কোম্পানীর নূতন হেড কোয়ার্টার যা তারা ওখানে বানিয়েছে, তা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ভাল এলুমিনিয়ামে তৈরী স্থাপত্যের ডিজাইন বলে উনিশ শ ষাটে পুরস্কৃত হয়েছে।

ভিভির হ্রদের উত্তর দিকের সুন্দর বেড়াবার জায়গাটা লা ট্যুর ড্য পীল্জ অর্থাৎ পীল্জ সফর নামে পরিচিত। এইখানে এই নামে বার শ আশীতে পিটার অব স্যাভয় একটা দুর্গ তৈরী করেছিলেন।

রুসোর আঠার শতকের নাম করা বই নুভেল হেলোয়া এই দুর্গকে ঘিরেই লেখা হয়েছিল। এই বইটা সারা ইউরোপকে অভিভূত করে দিয়েছিল। রুসোর এই বইটা লেখার পর থেকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে সুইট্জারল্যাণ্ডের উপরে। সুইট্জারল্যাণ্ড চিরকাল ঋণী থাকবে এই লেখকের কাছে।

সকালে উঠে অনেক কিছু ত দেখলাম। তার ফিরিস্তি অনেকটা দেওয়া হয়ে গেছে। দুপুরে ব্রেজ্ঞিয়ের নামে একটা সাধারণ রেসটুরেন্টে খেলাম।

বারে বারেই একই কথা লিখেছি ও লিখছি—সাধারণ খাবার জায়গারও একটা মানদণ্ড আছে। সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর হবে। নোংরা দেখে গা সিট্কে উঠবে না ও খাবার পর অসুখ করবে না। তাই ও সব দেশে অক্লেশে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়ানো যায়।

সারাদিন অবিশ্রাম ঘুরে বেড়ানো হোল। বিকালে এক ফাঁকে ষ্টীমারে করে একটু ঘুরেও নেওয়া হোল। তারপর আবার পথ।

সামান্য দূরেই মন্ত্রো। ইউরোপের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা এই মন্ত্রো। এখানে ফরাসী প্রভাব খুব বেশী।

ওখানে গিয়ে মনে হোল বিদেশীদের জন্যই যেন এই সুন্দর শহরটা বানানো। স্থানীয় লোকের চাইতে যেন টুরিস্টদের সংখ্যা বেশী।

দিনের আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এত রূপ এই শহরের যে ঘরে বন্ধ হয়ে তা থেকে বঞ্চিত করা যায় না নিজেকে।

● রূপের মোহ এমনই জিনিস। মানুষেরই হোক, মাটিরই হোক।

পাহাড়িয়া রেলগাড়ি চড়ে আমরা সমুদ্রের লেভেল থেকে ৮,০৯০ ফিট উপরে রসার্স দ্য নায়ে নামের স্কিয়িং করার তুষারক্ষেত্রে গেলাম। ওপর থেকে পুরো লেক জেনিভার দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দিল।

অপর একটা জিনিস দেখতে পেলাম, তা হচ্ছে আলপস্ পাহাড়ের চূড়া। আমাদের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। বেশীর ভাগ সময় মোটেই দেখা যায় না। ওখান থেকে নেমেই খাবার পাট সেরে নিলাম। সেরে নিলাম লিখলাম এই জন্য যে সেদিন সময়ের অভাবে মনে হয়েছিল খাওয়াটা সত্যিই শুধু শরীর রক্ষার্থে। হাতে মোটে সময় নেই, তাও খেয়ে সময় নষ্ট করতে হবে।

সাড়ে তিন মাইল দূরে শিলঁ, ইউরোপের একটা নামকরা দেখবার জায়গা। ওখানকার দ্বীপ দুর্গটা মনে রাখবার মত। এমনভাবে বানানো, মনে হয় যেন ভুরু কুঁচকে লেক জেনিভার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি বেশী সুন্দর, না আমি বেশী সুন্দর ?

দেখে মনে হোল লেক জেনিভার রূপের তুলনা নেই। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে হেসে খেলে বয়ে চলেছে। দুর্গটার কিন্তু মনে বিশ্বাস কম, তাই বুঝি সদর্পে তা ঘোষণা করছে।

তাই হয়, যে সত্যিকারের বিদ্বান সে হয় বিনয়ী। আর কম বিদ্যা যার, তার হয় অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।

স্যাভয়ের দ্বিতীয় পিটার, স্থপতি ম্যানিয়েরকে দিয়ে এই সুন্দর শহরটা গড়ে তোলেন। ইনি ভদে আরও দুটো সুন্দর দুর্গ গড়েন। একটা রুমাতে। আর একটা ইভাদোতেঁ।

লর্ড বাইরনের অমর কবিতা শিলঁর বন্দীতে পড়েছি যে এই দুর্গের অন্ধকার কারাকক্ষে ফ্রাসোঁয়া বনিভার্দ দীর্ঘকাল কাটিয়ে গিয়েছেন। তার অপরাধ ছিল, তিনি নূতন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চার বৎসর পর যখন বার্নিজরা ভদ প্রদেশকে স্বাধীন করে সেই সঙ্গে এই মহা-প্রাণেরও মুক্তি হয়।

এখন এই দুর্গটা জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। কি সুন্দর করে রেখেছে।

দিল্লির কথা মনে করিয়ে দেয়। আগের জিনিস সব কি সুন্দর করে রাখা হয়েছে। দিল্লিকে যে কোন ইউরোপের শহরের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যায়।

ওখান থেকে আমরা গেলাম রোন নদীর মোহনায়। শস্য শ্যামলা এই মোহনা দেখে যখন চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন শুনলাম এই ত সেদিনও এখানে কিছু হোত না। লোকেরা এটা চাষের অযোগ্য জলা বলে বরবাদ করেই রেখেছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন খাদ্যাভাব দেখা দিল, তখন লোকেরা ঠিক করল, একটা কিছু করা দরকার।

শুরু হোল মানুষের চেষ্টা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে করল যুদ্ধ ঘোষণা। বড় ব্যবসায়ীরা আরম্ভ করে দিল খনন আর জল সেচন পুরোদমে। দেখতে দেখতে রোন মোহনার চেহারা গেল বদলে, হয়ে উঠিল ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।

দেখে দেখে মনে হচ্ছিল ভগবানেরই সন্তান মানুষ। তাই ত ইচ্ছা করলে সে কি না করতে পারে।

রাতটা পথে বিপথে কাটিয়ে ভোরে গিয়ে পৌঁছালাম ফ্রাইবুর্গে। সঙ্গী জুটেছিল একটা ফ্রেঞ্চ রোমান ক্যাথলিক মেয়ে। আমরা সোজা বার্নে যাচ্ছি শুনে দুঃখের ভাব দেখাল। "তোমরা এত করে সুইট্জারল্যাণ্ড দেখছ আর ক্যাথলিক শহর ফ্রাইবুর্গকে না দেখে যাবে? পথেই ত পড়বে।"

"নাম শুনিনি কখনও।"

"নাম না জানা জিনিসও অনেক সময় ভাল হয়, মান ত ?"

"তা অবশ্য খুব মানি।"

"তাই বলছিলাম, কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে যাওনা ওখানে। আমি বন্ধুর কাছে যাচ্ছি।"

"মা, তাই চল, একটা দিনের ত মামলা।"

"পরে কিন্তু আবার পড়ার ক্ষতি হবে বলতে পারবে না।" এ বলে উঠল।

"বলব না, বলব না।"

ইংরেজীতেই কথা হচ্ছিল।

মেয়েটা ইংরেজী ভাঙা ভাঙা জানে ও বোঝে।

"সবারই যখন মত আছে তবে এখানে নেমে পড়া যাক। আমার জানা দেশ, আমি সব দেখিয়ে দেব।"

"তোমার বন্ধু তোমার জন্য অপেক্ষা করবে ত ?"

"ও জানে না যে আমি আসছি। আর বেশীদিন ত আর বন্ধু থাকবে না, আমাদের শিগগিরি বিয়ে হবে।"

"আগে বলনি ত ? কনগ্রেচুলেশন্‌স"—বলে অনু চেঁচিয়ে উঠল।

"বাঃ, তোমার হবু বরকে ফেলে কয়েক ঘণ্টা আমাদের জন্য নষ্ট করবে, এ কি রকম কথা।"

"অন্য দিকটা ভেবে দেখেছ ? বিয়ে যখন হবেই তখন মৃত্যু পর্যন্ত ত তার সান্নিধ্যে থাকতেই হবে। আমাদের ত আর ডিভোর্স নেই। তাই তার থেকে কয়েক ঘণ্টা কাটা গেলে লোকসানের জায়গাতে লাভ হতে পারে।" বলে মেয়েটা এমন হাল্কা মেজাজের হাসি হাসল যে আমরাও ওর সঙ্গে যোগ না দিয়ে পারলাম না।

"আসল কথা কি জান ? এখানকার সেণ্ট নিকোলাসের ক্যাথিড্রাল আমার বড় প্রিয়। ওখানে ঘুরতে ঘুরতেই প্রথম আমার দেখা হয় হবু বরের সঙ্গে। ঠিক করেছিলাম কোনদিন বিয়ে করব না। হেসে খেলে জীবনটা দেব কাটিয়ে। অনেকের সঙ্গে ভাব করেছি, কিন্তু জড়িয়ে পড়িনি। কিন্তু এর সঙ্গে চার্চে ঘুরতে ঘুরতে

কেমন যেন মনে হোল এর জন্যই আমি অপেক্ষা করেছিলাম। না চাইতেই পেয়ে গেলাম।

চেয়ে দেখলাম মুখের উপর বড় একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে। এরাও কি জন্ম জন্মান্তর বিশ্বাস করে?

বললাম, "তোমার কথা শুনে বড় ভাল লাগল।"

মেয়েটা আরও বলল, "বছর দুয়েকের ফাঁকে ফাঁকে দেখা হবার পর ও প্রপোজ করে। তারপর কথা দেবার আগে বাবা মার কাছে নিয়ে যাই। জান, কি সুন্দর ওর স্বভাব। দুদিনেই আমার মা বাবাকে এত আপন আপন করে নেয় যে ওরাও খুব সুখী হয়েছেন। ওর এক বোন আছে, বিয়ে করে ইটালীতে।"

"তাই বুঝি ওকে দেখেছ?"

"ছিলাম ত ওর কাছে গিয়ে। ভাল লেগেছে। সকলের আশীর্বাদের মধ্যে হবে আমাদের বিয়ে। সকলের ভাগ্যে কি তা হয়? এই আশাতেই দু বছর আমি চুপ করেছিলাম।"

শুনে এত ভাল লাগছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "ভগবান তোমাদের সব দিকে মঙ্গল করুন।"

মেয়ে তাড়াতাড়ি কানে কানে বলল, "তোমার কাছে যে মুর্শিদাবাদী মেয়েদের স্কার্ফ ও ছেলেদের রুমাল আছে তা এদের বিয়ের নাম করে দিলে কেমন হয়?"

"খুব ভাল হয়। তোর আইডিয়া, তুই দে। আর আমরা দেব আশীর্বাদ।"

আমাদের সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও জিনিস পেয়ে মেয়েটি যেন কেমন অভিভূত হয়ে গেল। তিনজনের হাত ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল। বলতে কিছু পারল না।

পরে সে শুধু বলল, "আমি কিছু বলতে পারছি না। আর কিছু বলব না। মনের বড় গভীরে এটা রেখাপাত করেছে। তাকে সামান্য কথা দিয়ে খেলো করতে পারব না।"

কিন্তু সামান্য একটা রেশমী রুমাল ওর জীবনের রূপকথাতে রঙ লাগিয়ে দিল।

মনে হোল, ওদেশের অল্প বয়সীদের মধ্যেও কত গভীরতা আছে। জিনিসগুলো স্টেশনে রেখে আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। কখনো হেঁটে, কখনো বাসে। নূতন সঙ্গিনীর সঙ্গে।

ফ্রাইবুর্গ হচ্ছে একটা ক্যাথলিক শহর। এখানকার লোকেরা শান্তিপ্রিয় ও অল্পে সন্তুষ্ট। অন্য সব দেশের লোকদের মত চাই, আরও চাই, এর দলে নয়।

এখানে নূতন ধর্ম ঢুকতে পারেনি। মনে প্রাণে এরা ক্যাথলিক। পনের শ আশীতে এখানে সেণ্ট মাইকেলের নামে একটা ক্যাথলিক কলেজ বানানো হয়। তার তিন শতাব্দী পরে স্যুইট্জারল্যাণ্ডের একমাত্র দোভাষী ক্যাথলিক স্টেট্ ইউনিভারসিটি হয়।

মেয়েটার কাছে এসব কথা শুনতে শুনতে আর চারিদিক দেখে মনে হোল, অগোচরে কত কিছুই জানবার ও দেখবার রয়ে যায়। এই মেয়েটার কল্যাণেই ত নামা হোল এখানে।

"আমি ত একটানা বকে যাচ্ছি। খারাপ লাগছে না ত?"

"ঠিক উল্টো। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেব এই সব বলে।" অনু হাসল।

"এখানে তিন ভাগের দুভাগ ফরাসী ভাষাভাষী। আর এক ভাগ জার্মান বলে।

এর রাজধানীতেই আমরা ঘুরছিলাম। মধ্যযুগেরই যেন শহরটা। পরিবর্তন বেশী কিছু হয়নি।

মেয়েটি ঠিকই বলেছে, এরা অল্পে সন্তুষ্ট। এখানকার ইনটার ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি বাইরে থেকে দেখলাম।

দুপুরবেলা চারজনে খেয়ে নিলাম রাস্তার ধারের কাফেতে। তারপরই মেয়েটা নিয়ে গেল সেণ্ট নিকোলাসের ক্যাথিড্রাল দেখাতে। এটা এগার শ বিরাশী সালে বানানো হয়। এর অর্গ্যানটা হচ্ছে

পৃথিবী বিখ্যাত। ক্যাথলিক সমাজে এই গির্জাটার এখনও খুব মর্যাদা আছে। এখানকার স্থাপত্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

এই চার্চটা ঘিরে তৈরী প্রাচীনকালের বাড়িগুলোকে এরা বড় যত্ন করে রেখেছে, পরিবেশটা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখবার জন্য। অন্যদিকে এর ইউনিভারসিটি একেবারে অতি মর্ডান।

এখানে হাটের দিন হচ্ছে বুধ ও শনিবার। সেদিন জোতদাররা মানে যাদের ক্ষেতখামার আছে, তারা ও তাদের স্ত্রীরা জাতীয় পোশাক পরে আসে।

একটা কথা বলা হয়নি। এখানে জমিহীন কৃষক নেই। আমাদের দেশ এত কাল পরাধীন ছিল বলে সেদিকে সরকার নজর দেয়নি। কিন্তু এখন দ্রুতগতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে। তাই এদিকেও সরকারের নজর পড়েছে। জমিহীন কৃষক আমাদের দেশেও থাকবে না।

ঐখানকার ছেলেদের ন্যাশনাল কসটিউম ভারী মনোহর। ছোট হাতার শার্ট, তার উপর ভেলভেটের জ্যাকেট। একটা ছোট টুপি শুধু মাথার চাঁদিটা ঢাকা যায় সেইরকম। টুপিটা অবশ্য কারুকার্য করা ভেলভেটের তৈরী বা খড়ের তৈরী।

মেয়েদের পোশাকও বেশ সুন্দর। হাতকাটা সুতীর পোশাক। কোমর টাইট, পা পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট, ব্লাউজটাও সুন্দর। তার সঙ্গে রঙ-বেরঙের ছিটের অ্যাপ্রন।

ছুটির দিনের পোশাক আরও কারুকার্য করা, দামী সূক্ষ্ম কাজ করা লম্বা হাতার ব্লাউজ ও লেস লাগানো টুপি। রূপকথার রাজ্য।

মেয়েটার সঙ্গে বিদায় নিয়ে আমরা তিনজনে বার্নের দিকে রওনা হলাম।

৬

সুইট্জারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন।

এই শহর না দেখে কারও যাওয়া ঠিক নয়। টুরিস্টরা যদিও

অনেকেই এখানে আসে না। বেশীর ভাগের ধারণা, এই শহরটি প্রাণহীন ও একঘেয়ে। এটি প্রাণোচ্ছল শহর নয়।

এই কথাটি অনেকেই বলেছিল। বলেছিল, "ওখানে কেন যাচ্ছ? সময় নষ্ট।"

বলেছিলাম. "দেখতে যাচ্ছি, জানতে যাচ্ছি, শিখতে যাচ্ছি। ক্ষণিকের আনন্দের জন্য নয়। চিরকালের. মানে যতদিন বেঁচে থাকবো তার জন্য জ্ঞান সঞ্চয় করতে। দূরে, বহুদূরে নিজের দেশে গিয়ে যা সকলকে বিলিয়ে দিতে পারব আর নিজেও এই চিন্তার মধ্যে বিলীন হতে পারব।"

এই শহরটির নামের ব্যাপারে, বেশ সুন্দর একটি রূপকথা আছে। এগার শ একানব্বইতে পঞ্চম বার্থোল্ড, জাহরিঙ্গেন জায়গার ডিউক, একটি অনাবিষ্কৃত বনে শিকার করে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় একটি কালো বিরাট হিংস্র ভাল্লুক তাঁকে আক্রমণ করে। ডিউক ভাল্লুককে মেরে ফেলতে সক্ষম হন। এরপর তিনি এখানে একটি শহর গড়ে তোলেন ও নাম রাখেন বার্ন।

জার্মান ভাষায় বার্ন মানে বিয়ার, ভাল্লুক।

এই রূপকথার সত্যতা কেউ জানে না। তবে এটা ঠিক, জাহরিঙ্গেন পরিবার থেকেই এই শহরটির উন্নতি।

আজকালকার ভাষা বিজ্ঞানীরা অবশ্য অন্য কথা বলে। তাদের মতে সেই সময় ইটালীর ভেরোনা নামে একটি শহর থেকে লোকেরা প্রথম এসে এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। সেই থেকেই এই শহরের নাম বার্ন। বি আর ভি ইনডো-ইউরোপীয়ান ভাষায় বিনিময় করা চলে। সেই করেই ভি বি ভাবে উচ্চারণ হয়।

ওদেশের বাচ্চারা কিন্তু অতশত বুঝতে ইচ্ছুক নয়। ওরা রূপকথার কাহিনীই সত্য বলে মনে করে।

বার্নের বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছিলাম দিল্লিতে থাকতেই। ওখানকার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের এশিয়া শাখার অধিকর্তার স্ত্রী ছিলেন এই শহরের মেয়ে। তিনিই আমাকে তার

দেশের অনেক কথা বলতেন। তখনও ভাবিনি কোনদিন ওখানে যেতে পারব। বড় ভাল লাগত শুনতে। সেইখানেই আজ চলেছি। মনের মধ্যে কত কথাই ঠেলে উঠছে।

মানুষ হারিয়ে যায়, কিন্তু মনের মণিকোঠায় থেকে যায় জ্ঞানের মণিমুক্তো সব।

তেরশ তিপ্পান্নতে বার্ন সুইস কনফেডারেশনে যোগ দেয়। এখানকার ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় বার্ন এদেশের রাজধানী হয়। অনেক আগে এদেশের সব ঘরবাড়ি ছিল কাঠের তৈরী। চোদ্দ শ পাঁচে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শহরটিই ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর গড়ে ওঠে সুন্দর প্ল্যান করা শহর। বেলে পাথরে তৈরী এক অপূর্ব শহর। এদেশেরই পাথর ভেঙে তৈরী। তারপরে সতের ও আঠার শতকে এই শহরে নূতন ধরনের স্থাপত্যের বাড়িঘর গড়ে ওঠে।

কতকাল আগের ধ্বংসের কথা এখনও লোকে বলে এবং খুশী মনেই বলে। "সেই সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড না হলে আমাদের এই শহর আজকে এত সুন্দর হোত না।"

সত্যি কথাই। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সঞ্চয় করা। তাই প্রয়োজন হলেও তারা ভাঙতে পারে না। তাই বিধাতার অমোঘ নিয়মে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তা থেকে জন্ম নেয় নূতন, নবীন, সুন্দর।

তাই আমরা, হিন্দুরা তিন শক্তি, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কে সমান আসনে বসিয়ে সমান মর্যাদায় পুজো করি।

আরও একটি কথা ভদ্রমহিলার কাছে জেনেছিলাম যে এই দেশের বেশীর ভাগ অধিবাসীরাই অভিজাত বংশোদ্ভূত। ওখানকার দু'একজনের সঙ্গে কথা বলেই তা বেশ বুঝতে পারলাম। সাধারণ বা অসাধারণ সকলেরই কথাবার্তা বা চালচলনে আভিজাত্যের ছাপ পরিস্ফুট। এরা নূতনের মোহে সহজে পড়ে না। এরা সংরক্ষণশীল।

বার্ন দেশবাসীর ঐতিহ্য আছে। সে বিষয়ে তারা সচেতন। তা বলে কি তারা নূতন কিছু নেয়নি? তা মোটেই নয়।

যাদের ঐতিহ্য থাকে তারা নূতন কিছু নিতে আপত্তি করে না। তবে বিচার করে, ভাবে, তারপরে গ্রহণ করে।

এখানে এসে একটা সাধারণ হোটেলে উঠলাম। সুইট্জার-ল্যাণ্ডের লোকেরা এত অবস্থাপন্ন যে সহজে কেউ পেয়িং গেস্ট রাখতে চায় না। রাতের খাওয়া পথে সেরে নিয়েছিলাম। চোখ বুজে ঘুম আসছিল না। অনেক কথাই মনে আসছিল।

এই যে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, অস্বাভাবিক ত কিছু ঠেকছে না। যখন দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলাম মেয়ের টানে, তখন ভেবে-ছিলাম অল্প দিনের পরই ফিরে আসব। বিদেশে বিভুঁয়ে ছন্নছাড়া জীবন কাটাতে ত ভাল লাগবেই না। আর এখন কেমন দিনের পর দিন পথের উপর কাটিয়ে দিচ্ছি। মনে কোন দ্বিধা নেই। এই চলাটাই যেন স্বাভাবিক। এই অস্থিরতার মধ্যেই যেন জীবনটা কেটেছে।

সত্যিই, মানুষ অভ্যাসের দাস।

মনে মনে ঠিক করে নিলাম, সকালে উঠে প্রথমেই যাব ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ার্টারের দিকে। এখানকার রাজনীতি বা কূটনীতি সত্যই সংযমী। আর দশটা দেশের মত নাচ গান পার্টিতে আবদ্ধ নয়। আরও একটা বিশেষত্ব, অন্যান্য কসমপোলিটান শহরের মত নিজের সত্তা এই শহর হারিয়ে ফেলেনি। এরা দাঁড়িয়ে আছে নিজেদের সংস্কার ও ঐতিহ্যের ওপর।

এসব কথা জানবার পর আমার মনের মধ্যে খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল এই শহরে আসবার। মনে হয়েছে এই দিক দিয়ে বুঝি আমার ভারতবর্ষের তুলনা করা যায়। কত বিভিন্ন দেশের সমাজের ধর্মের লোকেরা এলো গেলো, কিন্তু ভারতবর্ষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সকালে উঠে রাতে ঠিক করা প্ল্যান অনুসারে বেরিয়ে পড়লাম। এলফেনস্ট্রাসে, থুনস্ট্রাসে ও ম্যারিয়েনস্ট্রাসের দিকে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে এখানকার কাজ এত বেড়ে যেতে থাকে যে এসব রাস্তার

উপরে যে ডিপ্লোম্যাটিক অফিস ও কোয়ার্টার ছিল তা অকুলান হয়ে পড়ে। তাই গড়ে ওঠে আরও একটা নূতন কলোনী মায়জিলি।

এখানে ঘুরে ফিরে একটা কথা মনে হচ্ছিল, এই শহরটা অনেকের চাইতে স্বতন্ত্র। অনেক শহরই টুরিস্টদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক যেমন রূপসী তরুণী যার জীবনে আর কিছু নেই, সে সেজেগুজে লোকের মন ভুলাতে চায়। একেবারে স্ফূর্তির ফোয়ারা।



স্ফূর্তির ফোয়ারা

এই শহরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাই বোধ হয় আমার ভাল লাগল। অন্য দেশের একঘেয়েমীটা কম। ওখানে যখন আপন মনে আমরা ঘুরছিলাম হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমাদের দেশের কূটনীতিকের সঙ্গে।

"একি, তোমরা এখানে? আর আমরা কিছু জানি না?"

দেখলাম সে চোরের মত মুখ করে বলছে, "ভাই, কাজে ত আসিনি। এসেছি সাধারণ লোকেদের মত মন খুলে আনন্দ করে দেশ দেখতে। তাই আর জানাইনি।"

"এ আবার কি? কত জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে। কোন মানে হয়?"

আমি বললাম, "জান, অনেকদিন ত সব আগে থেকে সুব্যবস্থার মধ্যে ঘুরেছি, থেকেছি। যাকে বলে ছকে আঁটা সব কিছু। তার বাইরেটাও ত জানতে দেখতে ইচ্ছা করে। তাই বেশীর ভাগ জায়গাতেই কাউকে না জানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভেবেছিলাম অসুবিধা হবে। দেখছি, অসুবিধা কিছু নেই। নূতনত্ব ভাল লাগছে। কিছু মনে কোর না।"

মিসেস তাড়াতাড়ি বলল, "তা মন্দ বলনি; সুবিধা অসুবিধা ত মনের কাছে। তবে ধরা যখন পড়েই গেছ আর দুপুরের খাবার সময় প্রায় হয়ে এলো, চলো আমাদের সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ খাবে আর গল্প হবে।"

"তথাস্তু" বলে উঠে পড়লাম সবাই মোটরে। আমাদের নিয়ে গেল দি ক্যাসিনো নামে একটা রেস্তোরাঁতে। ওখানে ঢুকে বেশ লাগল। এর ভিতরের অলংকরণ আর আসবাবে একটা ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। চটকদার নয় কিন্তু। নিজস্ব একটা আভিজাত্য আছে। মানে ফ্যাশন নেই, স্টাইল আছে।

বসেই বন্ধুবর সুইস্ ওয়াইনের অর্ডার দিল। তার সঙ্গে এখানকার হ্রদের পার্চ মাছের ফ্রাইড ফিলেট। এখানকার বিশেষত্ব। আরও দিয়েছিল বার্নের প্লাটে নামে একটা পাঁচমিশেলী খাবারের ডিশ। এই শহরের আরও একটি বিশেষ খাবার।

আমি আর মিসেস জমে গিয়েছিলাম নিজেদের গল্পে। কতকাল পরে দেখা।

"জান, আর ভাল লাগে না। কতকাল ধরে শুধু বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যখন রিটায়ার করে দেশে ফিরব, কেউ আমাদের চিনবে না। আর আমরাও বোধহয় দেশকে সে রকমভাবে গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের অবস্থা হচ্ছে জলেরও নয়, ডাঙারও নয়। তোমার

স্বামী স্বদেশে ভাল চাকরি করলেন বা করেছেন। সবাই জানে, চেনে। রিটায়ার করার পরও সবাই জানবে, চিনবে।"

"কথাটা ঠিক বলেছ। তবে অন্য দিকটা ভাব। কত দেশ দেখলে বা দেখবে, তার মূল্য নেই? কত শিখলে, কত জানলে। দেশকে জানতে, আবার জানবে। ভগবান যাকে বলে তুলাদণ্ড ধরে বসে আছেন, সবাইকে সব কিছু দেন না। একে যা দেন, তাকে তা দেন না।"

"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। এভাবে কখনও ভাবিনি। এই ভাবেই নেবার চেষ্টা করব। তবে মুখে বলা যত সহজ, গ্রহণ করা তত নয়।"

"ভাই, ঠিকই বলেছ। বুঝি ত সব। আমিই কি পুরোপুরি পারি? তবে চেষ্টা করি।"

অনু বলে উঠল, "তোমরা কি যে আস্তে আস্তে অফুরন্ত বকে যাচ্ছ। খাবার ত এসে গেল। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

"তোমার মা আর আন্টির কথা ত তোমার মনে নেই। তুমি তখন খুব ছোট। একসঙ্গে হলেই সারা দুনিয়া অন্ধকারে ঢেকে যেত।"

"আশ্চর্য, দেখছ একটা জিনিস? এত বৎসর পরে দেখা, মনে হচ্ছে রোজ দেখা হয়, গতকালও দেখা হয়েছে," সে বলল।

"বোঝ না, অল্প বয়সের বন্ধুত্বের তুলনা নেই। বেশী বয়সে বোধ হয় ততটা কাছে আসা যায় না।"

নানা রকম গল্পের মধ্যে সময়টা ভাল কাটল। ওরা আবার সেইদিনই বিকালে কি কাজে প্যারিসে চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভাবে দেখা হয়ে গেল। আমার দেশের কূটনীতিকের কাছেই সব চাইতে আসল কথাটা জানলাম।

"এখানকার সব চাইতে বিশেষত্ব হচ্ছে এরা কর্মই ধর্ম এই নীতিতে বিশ্বাসী। শুধু বসে বসে রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। শাসনতন্ত্র মানে গভর্নমেণ্ট থেকে রাজনীতি একেবারে সরিয়ে

দিয়েছে। এরা যে শুধু ভদ্র তা নয়। এদের মধ্যে মর্যাদা-জ্ঞানও যথেষ্ট।"

এ সব শুনতে শুনতে নিজের দেশের কথা মনে হোল। আজ আমাদের ভাগ্যগুণে কত বড় বড় দেশনেতাদের আমরা পেয়েছি।

আমরা সাধারণ লোকেরা কি এসব কথা ভাবি? যে দেশে মানুষের আত্মমর্যাদা জ্ঞান নেই সে দেশ বড় হওয়া খুব কঠিন। কটা টাকা বেশী পাবার জন্য আমরা সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে বিদেশে পড়ে থাকি। এই দেশ মা তাঁর রক্ত মাংস দিয়ে কত কষ্ট করে বড় কোরে তোলে সবাইকে। কোন কৃতজ্ঞতা কি আমাদের মনে আসে?

এই দেশেই একদিন কত মহান লোকের জন্ম হয়েছে যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের পুণ্যের জোরেই ভারতবর্ষ আজও দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে।

বন্ধুরা আমাদের বার্নার স্ট্রাসে নামে রাস্তার উপরে যে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম আছে তার কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওখানকার সব চাইতে সুন্দর দেখবার জিনিস হচ্ছে আফরিকার মৃত জন্তু জানোয়ারদের কি সুন্দর করে ওরা স্বাভাবিক পরিবেশে সাজিয়ে রেখেছে। বন বাদাড়ে, জলে জঙ্গলে। ঠিক মনে হয় ওরা জীবন্ত; প্রাণহীন নয়।

এই ধরনের জাদুঘর আমি কখনও দেখিনি। বড় ভাল লাগছিল। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। তাই অন্যান্য জাদুঘরের কথা না লিখে এটার কথাই লিখলাম।

ঘোরাঘুরি করতে করতে খেয়াল করিনি যে কখন দিনের আলো নিভে গিয়ে রাতের আলো জ্বলে উঠেছে।

ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশেই আলোর দিক দিয়ে রাত ও দিনের তফাত খুবই সামান্য। সূর্যের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বিজলী বাতি। তাই রাত বারটা পর্যন্ত বাইরে থাকলেও মনে হয় না অনেক রাত হোল।

হাতের ঘড়িটাই শুধু টিক্‌টিক্ করে জানিয়ে দেয় বাড়ি ফেরার সময় হোল, শোবার সময় হোল। সে দিক দিয়ে এ সব দেশ হচ্ছে টুরিস্টদের জন্য স্বর্গরাজ্য।

আলোর ঝলমলানি দেখে ফিরলাম আস্তানায় সারাদিনের ক্লান্তিকে বিদায় দিতে।

৭

এই শহরটার নাম বার্ন না হয়ে কেন যে বর্ণ মানে রঙের খেলা হোল না, সেই কথাই ভাবছিলাম ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে।

অতি সুন্দর কারুকার্য খোদাই করা ফোয়ারাগুলোর ভেতর থেকে জল ছিটিয়ে পড়ছে। শুধু কি সাদা সাধারণ জল? না, তার মধ্যে আছে নানা রঙের আলোর খেলা। মনে হচ্ছিল, সেই কোন্ যুগে পড়া ঠাকুমার ঝুলির থেকে যেন নেমে এসেছে এই ঝরণা যার ভিতর থেকে ঝরে পড়ছে হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না।

এইসব প্রাণচঞ্চল ফোয়ারার পেছনে রয়েছে মধ্যযুগের সব বাড়ি যা চোখকে তৃপ্তি দেয় না। দেখে মনে হয় সাবেক কালের স্থাপত্য বড় কঠোর। তবুও ভাল লাগছিল এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, কোমল ও কঠোর। "দি ফাউন্টেন অব জাস্টিস" নামের ফোয়ারা আর দশটা এই নামের ফোয়ারারই মত। দেবী তুলাদণ্ডের প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন; কাছে তলোয়ার এবং দাঁড়িপাল্লা। দেবীর চোখ বাঁধা। বিচার যেন চুলচেরা হয়। কাটা মাথা সব পায়ের কাছে পড়ে আছে; রাজা, মহারাজা, এমন কি ধর্মযাজকের। তার সঙ্গে বার্ন শহরের মেয়রেরও। মেয়রেরটাও আছে সর্বসাধারণকে বোঝাবার জন্য যে অন্যায়ের শাস্তি বড় ছোট সকলের জন্যই সমান।

এই মূর্তিটা দেখে আমার দেশের মা কালীর মূর্তির কথা মনে এল। কত হাজার বৎসর আগে আমাদের দেশে এই ধারণা

এসেছিল। তখনই এক অব্যক্ত আনন্দে মন ভরে গেল—এই দেশ ও দেশবাসী পড়ে থাকতে পারে না।

সতের শ উনত্রিশের একটা চটকদার স্টাইলের চার্চের কাছে এসে চোখে পড়ল ব্যাগপাইপার ফোয়ারা। এখানে খোদাই করা আছে এই শহরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। ফোয়ারার পেছনে রয়েছে ডাচ দুর্গ। এই নামকরণের পেছনে একটা মজার কিংবদন্তী আছে। ডাচ যুদ্ধের পরে যখন এই শহরের মিলিটারী অফিসাররা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটা বদ অভ্যাস। সিগারেট বা চুরুট খাওয়া তখন ছিল নিষিদ্ধ। যুদ্ধের সময়কার এই অভ্যাস তারা ছাড়তে পারেনি। সবাই চুপে চুপে এখানে এসে একসঙ্গে সিগারেট খেত। সেই থেকেই এই দুর্গের নাম হয় ডাচ দুর্গ।

পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল এখানকার পার্লামেন্ট। চারিদিক ফুলে ফুলময়। ঠিক নয়া দিল্লীর পার্লামেন্টের মত। এরই কাছাকাছি আরও দুটা নাম করা ফোয়ারা আন্না সীলার, মার্কসম্যান আর ওগর অর্থাৎ দানব নামে একটা ফোয়ারা। এ দেশে ফোয়ারার অন্ত নেই।

ওগর ফোয়ারার কারুকার্য আমার অবশ্য মোটেই ভাল লাগেনি। একজন দানব ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে ধরে খাচ্ছে। বীভৎস। জানি না, এদের কোন্ পৌরাণিক ঘটনা থেকে এটা নেওয়া হয়েছে।

এখানকার অ্যাস্ট্রনমিকাল ক্লকটা দেখতে বেশ মজা লাগছিল। শুধু যে সময় সংকেতের ঘণ্টা বাজে তা নয়। এখানে ফাদার টাইম সময় মাপার ঘণ্টা হাতে নিয়ে আছে। একজন ক্লাউন ঘণ্টা বাজাচ্ছে। একটি মোরগ ডাকছে কঁকর কোঁ। একটি যোদ্ধা পোশাক-আশাক পরে তৈরী। এই মজাদার সমাবেশের সবসে সেরা মজা হচ্ছে একটি সঙ্গীতপ্রিয় ভালুকের দল। এরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে।

ঘোরাঘুরি করতে করতে আরও কয়েকটা ফোয়ারা দেখলাম। জাহরিঙ্গার ফোয়ারার গায়ে খোদাই করা রয়েছে এক বিরাট ভালুক। আর বাচ্চা ভালুকগুলো আঙুরের রস খাচ্ছে।

তারপরই টাউনহল। সারা সুইট্জারল্যাণ্ডের মধ্যে এর খুব নামডাক। চার্চকে বাদ দিলে এর কারুকার্যই নাকি সব চাইতে সুন্দর। অতশত বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। স্থাপত্য বিশারদ আমি নই। চোখে যা ভাল লাগে তাকে আমি বলি সুন্দর। সেই মাপকাঠিতে মন ভোলানোই বটে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একমনে আমরা দেখে যাচ্ছিলাম, মুখে কুলুপ এঁটে। মুখ চললে পায়ের গতি হবে ধীর।

এত সব দেখার পরে কথা না বলার প্রতিজ্ঞা আর তো রাখা গেল না। আমিই কথা বলে উঠলাম, "কি যে সব বোবার মত চলেছি।"

"সেই কথাই ত ছিল। তুমি যখন প্রতিজ্ঞা ভাঙলে, তখন এক নাগাড়ে তোমাকে বেশ কয়েক মিনিট বকে চলতে হবে। থামতে পাবে না।" সে বলে উঠল।

"তাই ত চাইছিলাম। শোন, এখন তুপুরের খাবারের সন্ধানে যেতে হবে। পেট একেবারে চোঁচোঁ করছে। সকালে গন্ধমাদন পেটে ঢুকিয়ে কোন লাভ হোল না।"

"কি রেটে হাঁটা হচ্ছে জান?" অনু বলল।

"ভাগ্যিস, নিজের দেশে এই রেটে হাঁটি না।"

তবে ত মুশকিল হয়ে যেত।

"ওখানে ত আর ফরেন-এক্সচেঞ্জের বালাই নেই। তাই যত পার খাও।"

ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম খাবার সন্ধানে। একটি ছোট রেস্টুরেন্টে খেতে বসে বুঝলাম জার্মান প্রভাব এদেশে কতখানি। ইটালী থেকে এসে যারা এখানকার অধিবাসী হয়ে গেছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা তাদেরও রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে।

ছোট জায়গাটা, কিন্তু লোকেরা কলের কাঁটার মত কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই কথাটা মনে এলো রেস্টুরেন্টটি ইটালিয়ান

বলে। এখানে আমরা ইটালিয়ান খাবার নিলাম। ভারতীয়দের ইটালিয়ান ও স্প্যানিশ খাবার ভাল লাগবে। আমাদের খাবারের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। কেন, কি করে, ঠিক জানি না। চেহারাতেও খুব বেশী না হলেও কিছুটা আদল আসে, স্বভাব চরিত্রেও।

ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম ন্যাইডেগ ব্রিজের দিকে। এখানকার বিখ্যাত বিয়ার পিট অর্থাৎ ভাল্লুক গুহা ব্রিজটির কাছে। আমাদের দেশে চিড়িয়াখানার বাইরে চীনাবাদাম, কলা ইত্যাদি বিক্রি হয়। সবাই ওখান থেকে কিনে জানোয়ারদের খাওয়ায়। ভাল্লুক গুহার ওখানেও ঠিক তাই দেখলাম। কাছেপিঠে গাজর কিনতে পাওয়া যায়। গাজর কিনে সবাই ভাল্লুকদের খাওয়াচ্ছে ওদের বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা হাসি দেখবার জন্য।

ওখানকার অভিজাত বংশের লোকেদের তৈরী বিরাট বিরাট ম্যানসন ঐ শহরের সৌন্দর্য অনেকটাই বাড়িয়েছে।

বেলা পড়ে আসছে দেখে আর দেরি না করে আমরা ছুটলাম এদেশের বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল দেখতে। গথিক স্টাইলে বানানো এই গির্জাটি ম্যাথু এনসিঙ্গার নামে একজন বিখ্যাত স্থপতি চোদ্দ শ একুশে বানাতে আরম্ভ করে। বার্ন শহরের অনুপাতে এই গির্জাটি এত বিরাট করে বানানো হয় যে এখানকার অর্ধেক লোক একসঙ্গে এর মধ্যে প্রার্থনা করতে পারে। আঠার শ তিরানব্বই সালে এই গির্জাটি সম্পূর্ণ হয়। তখনকার দিনের নামী স্থপতিদের সকলেরই হাতের ছোঁয়া এতে আছে। এই গির্জাটির বাইরের কারুকার্য অপূর্ব।

এখানে খোদাই করা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র লাস্ট জাজমেন্ট। এ ছাড়াও দুটি সুন্দর মূর্তি আছে। ওয়াইজ অ্যাণ্ড ফুলিশ ভার্জিনদের। চার্চের ভেতরের সূক্ষ্ম কাজ করা রঙীন কাঁচ চোখে পড়বার মত। কিছু কিছু জানালার কাঁচ নূতন করে বসানো হয়েছে ; কিন্তু কারুকার্য এমনভাবে করা হয়েছে যে বোঝাই যায় না, সেগুলি পরে করা।

নদীর ধারে উঁচু জায়গাতে ক্যাথিড্রালটা। গরমের সময় গির্জার ধারের খোলা মাঠে এরা থিয়েটার করে।

এখানকার ইউনিভারসিটিও বেশ নাম করা, বিশেষ করে আইন বিভাগ। ছেলেরা ইউনিভারসিটির মধ্যেই থাকে। তবে মাঝে মধ্যে শহরে এসে তাকে জীবন্ত করে তোলে।

সুইটজারল্যাণ্ডের একটা বিশেষ নিয়মের কথা লিখতেই ভুলে গেছি। ইউরোপের সর্বত্রই কোন ছেলে বা পুরুষ কোন অচেনা মেয়েকে নাচবার জন্য আমন্ত্রণ করতে পারে না। তা হবে অসভ্যতা। এদেশে কিন্তু তা নয়, অচেনাকে নাচতে বলাটা অশোভন নয়।

রাতে আমরা একটু খরচ করে গেলাম একটা মন্দের ভাল মানে মাঝারি মত বড় হোটেলে। একটা রাত পয়সার দিকে নজরটা না রেখে ঢুকেছিলাম গিয়ে স্বোয়াইজার-হফ হোটেলে। এখানে খাবার সময় কোমল সুরে বাজনা বাজে। তারপর সাবেক কালের লোকাচার বিছা দেখায়।

এদের কথাবার্তা ঠিক আমরা ধরতে পারছিলাম না। সবই জার্মান ভাষায় হচ্ছিল। ঘুমও পাচ্ছিল দারুণ। সারাদিন পায়ের ওপর। খোলা পরিষ্কার হাওয়ার মধ্যে থেকে নার্ভগুলো সব শান্ত স্থির হয়ে গেছে। তাই চোখ জুড়ে আসছিল। আমরা তাই লোকাচার বিদ্যা আরম্ভ করার কিছু পরেই পড়লাম উঠে। পরের দিনের রসদ জোগাড় করে রাখতে হবে ত।

সত্যি, আমরাও একদিক দিয়ে উটের মত। ওরা খাবার সঞ্চয় করে রাখে শরীরের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য। আমরা সঞ্চয় করি কর্মশক্তি।

এদেশে চোখের উপরে ভোরের আলোর ঝিকিমিকি খেলাতে ঘুম ভাঙে না। আমরা আলোর দেশের লোক বোধহয় বহুদিন ধরে অনেক হিসাবে অন্ধকারে পড়ে আছি বলেই দিনকে আমরা ভালবাসি। এদের মত রাতকে দিন করি না। সূর্যের প্রতাপ

এখানে নেই বললেই চলে। তাও তারা পর্দা টেনে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে রাতে ঘুমোতে যায়। আমাদের সে বালাই নেই।

ঘড়ি এদের বড় আপনজন। এমন অভ্যেস করেছে যে নিজেরাও এক একটি ঘড়ি হয়ে গেছে। আমরাও অবশ্য অনেকটা সেই অভ্যেস করে নিয়েছিলাম। যস্মিন্ দেশে যদাচার।

সকালে বাইরে না গিয়ে হোটেলেই বসেছি খেতে। বেশী একটু লাগবে যদিও। তাও মনে হোল, যেখানে রইলাম তার সঙ্গে যাবার আগে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। পয়সা বাঁচাতে সব খাবারই বাইরে খাওয়া হয়েছে। তাছাড়া রেস্টুরেন্টে খেলে সহজে লোকদের সঙ্গে চেনা হয় না। বন্ধুত্বের মতলবটাই মনের মধ্যে ছিল।

আশ্চর্য! ভগবান মনের কথাটা বুঝে নিয়েছিলেন। চেনাও হয়ে গেল একজন সাদাসিদে বার্নিজ ওবারল্যাণ্ডের লোকের সঙ্গে।

ওখানকার লোকেরা বেশীর ভাগই সহজ সরল। বইয়ে তাই পড়েছিলাম। লোকটির সঙ্গে চেনা হয়ে বুঝলাম সত্যিই তাই।

আমরা এখান থেকেই বেরিয়ে পড়ছি শুনে দুঃখিত হলেন।

"তোমরা বার্নিজ ওবারল্যাণ্ডকে একবার চোখের দেখা না দেখে চলে যবে? এসেছ কতদূর থেকে, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বার্নে। তার সব চাইতে সুন্দর জায়গাটা অদেখা থেকে যাবে?"

ওর আগ্রহ দেখে মনটা কেমন যেন করে উঠল। এতই যখন ঘুরছি কেন আরো একটা দিন এর সঙ্গে জুড়ে দিই না?

সবাই মনস্থির করে ফেললাম যাব বলে। পরমুহূর্তেই মনটা গেল বেঁকে যখন শুনলাম যাবার ঝকমারি আর পয়সার ছড়াছড়ি। মানে, পয়সা ছড়িয়ে চলবার ক্ষমতা চাই। সেদিক দিয়ে আমাদের পুরো না হলেও প্রায় ক্ষমতার বাইরে।

তখন গলা খাটো করে ভদ্রলোককে বললাম, "ভাই, সাধ থাকলেও সব সময় সাধ্য থাকে না। তুমি ওখানকার লোক। আর যখন বিকেল পর্যন্ত হোটেলে থাকবে ঠিক করেছ, তবে এই

অভাজনদের তোমার দেশের কথা শুনিয়ে দাও না। দেশে গিয়ে আমার দেশের লোকেদের তা বলব।"

লোকটি সত্যিই ভদ্র ও ভাল। আমাদের আগ্রহ দেখে নিজের দেশের কথা সাগ্রহে বলতে শুরু করল। বার্নিজ ওবারল্যাণ্ডে যাবার পয়সা ও সময় বেঁচে গেল এই পথে পাওয়া বন্ধুটির জন্য। তাই হাত খুলে দু' পয়সা ছড়াতে ইচ্ছা হল সকলের।

এই হোটেলেই দুপুরের খাবার জন্য ওকে নেমতন্ন করে দিলাম। বলতে গেলে নিজেদেরও করলাম।

পথের ধারের কাফেতে খাওয়া থেকে এক লাফে ওপর তলায় উঠে গেলাম। অর্থাৎ হোটেলে খাব।

বুদ্ধিটা আমার, তবে উৎসাহ দিল মেয়ে। কত কম খরচে দেশটা জানা হয়ে যাবে সেই হিসেব এক মিনিটে কাগজ পেনসিল নিয়ে কষে দেখিয়ে দিল।

ব্যাস, আর নো উচ্চ-বাচ্য। এক কথায় সব ঠিক।

চারজনে গোল হয়ে বসে পড়লাম।

"জান, রুসোই প্রথম তাঁর অমর লেখনীতে ওবারল্যাণ্ডের বন্য পর্বতমালার সৌন্দর্যের কথা লিখেছিলেন। উনিশ শতকে অনেক ফরাসী আর ইংরেজ রাজারাণী ওখানে বেড়াতে যান। লর্ড বায়রনও ঐ জায়গার কথা তার বইয়ে লেখেন। কত যে নামী ও দামী লোকেরা সেখানে গেছেন ও তাঁদের লেখনীতে ধরা দিয়েছে বার্নিজ পাহাড়ী দেশের সৌন্দর্য তার ঠিক নেই। দু'চারটা নাম বলছি, শোন: গ্যেটে, শেলী, থ্যাকারে, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড ইত্যাদি।"

"এত সুন্দর করে তুমি বলছ যে ওখানে না যেতে পারার দুঃখ বিশেষ থাকবে না। আচ্ছা, তোমাদের দেশীয় পোশাক-আশাকের কথা বল না। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে।" এ বলে উঠল।

"আমাদের দেশে, আমরা মানে মেয়েরা কিন্তু নিজস্ব পোশাক, মানে শাড়ী পরা চালিয়ে যাচ্ছি। মনে হয় চিরকালই যাব। যদিও অন্য পোশাকও আমাদের দেশের মেয়েরা মাঝে মাঝে পরে।"

আমার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বলল, তোমরা বোধহয় জান না, এই সামান্য জিনিসটা বাইরে তোমাদের ইমেজ, ভাবমূর্তি কত বড় করে দিয়েছে। শত শত বৎসরের পরাধীনতার মধ্যেও তাই তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছ। আর এখন ত পৃথিবীর চোখ তোমাদের দিকে।"

"ঠিকই বলেছ! আমাদের দুঃখের দিন কেটে গেছে।" সে বলল।

"আমাদের বার্নিজ ওবারল্যাণ্ডে নিজস্ব পোশাক আজকাল আর বিশেষ লোকে পরে না। তবে কিছুদিন যাবত সেদিকে লোকের দৃষ্টি গিয়েছে। রবিবার দিন অনেক সময়ই দেখা যায়, মেয়েরা ও বাচ্চারা নিজস্ব পোশাক পরে বেড়াচ্ছে। আগের দিনের পোশাক সত্যিই ছবির মত।"

এই বলে নিজের ঘর থেকে একটা ছোট ছবি এনে দেখাল। ওর মা, স্ত্রী, বোন ও তাদের বাচ্চারা পুরোনোকালের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে।

"যেমন সুন্দর দেখতে সব, পোশাকও তেমনি।" একটু হেসে সে ছবিটা রাখতে চলে গেল।

"দেখেছ, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ এক। তাদের দেশ বা দেশের জিনিসকে প্রশংসা করলে কত খুশী হয়। আমরা কেউ কেউ কিন্তু নিজের দেশের নিন্দে করি। বুঝি না যে তাতে নিজেকেই ছোট করা হয়। এই জ্ঞান যেদিন সকলের মধ্যে আসবে।" বলতে বলতে ওকে আসতে দেখে থেমে গেলাম।

যতটা সম্ভব জেনে নেই। খাবার সময় হয়ে এলো। তারপরই গোছানোর পালা।

"ওখানকার লোকেরা বেশীর ভাগ কি করে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"পৃথিবী বিখ্যাত কাঠের কাজ ব্রীয়েঞ্জে গত শতকে আরম্ভ হয়। এখন কাঠেতে খোদাই করা কাজের ইন্ডাস্ট্রী গড়ে উঠেছে। ফিশার নামে এক ভদ্রলোক নানা কারুকার্য করা কাঠের পাইপ বানাতে

আরম্ভ করে। তারপর এইভাবে সে ছোট ছোট নানা জিনিস বানায়। তার সূক্ষ্ম কাজ বড় ব্যবসায়ীদের চোখে পড়ে। এইভাবে একটা বড় ইন্‌ডাস্ট্রী গড়ে ওঠে। এখানকার হাতীর দাঁতের কাজেরও খুব সুনাম আছে।"

"তোমাদের দেশে হাতির দাঁত কোথায় পাও?"

"তোমাদের দেশ আর আফ্রিকা থেকে আনানো হয়।"

"আচ্ছা, তোমাদের দেশের লেসের কাজের ত বেশ সুনাম আছে?"

"ঠিক বলেছ। এখনও বানানো হয়, তবে বাইরে চালান দেবার মত কিছু নয়। ভারতবর্ষের মত বার্নিজ ওবারল্যাণ্ড হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ। তুমি যেখানেই যাওনা কেন, চোখ জুড়িয়ে যাবে খামার দেখে।"

একটু পরে সে বলল, "সব চাইতে বড় কথাটাই বলিনি। আমরা অতিথি বৎসল। ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশবাসীর মত ছাড়া ছাড়া নই। টাকা আমাদের নিতে হয় ঠিকই, তবে সেবা ভালবাসাও দিই। তাই আমি জানি তোমরা যদি যেতে পারতে তবে আবারও যেতে।"

এত ভাল লাগছিল ওর কথা শুনতে যে ভুলেই গিয়েছিলাম ঘড়ির দিকে তাকাতে। "লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। শেষে দরজা বন্ধ করে দেবে। চল সবাই।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। যেতে যেতে মনে হোল, তাইত, সে হচ্ছে থুন নামের শহরের লোক। তার জায়গাটার কথাই ত জিজ্ঞাসা করা হোল না।

থুনের কথা ত কিছু বললে না? তোমার সঙ্গে চেনা হোল, তোমার জায়গার সঙ্গেও পরিচয় হয়ে যাক।"

আমার থুন শহর হচ্ছে ছবির মত দেখতে। এখনও মধ্যযুগের চেহারা নিয়েই সে আছে। এখানকার লোকসংখ্যা অতি সামান্য। এর চরিত্রও মধ্যযুগের, চাল-চলনও প্রায় তাই। সেইজন্য এর একটা স্বতন্ত্র আভিজাত্য আছে।

"আমার খুব ইচ্ছে করছে যেতে। অতি আধুনিক সব চারিদিকে দেখে দেখে এক এক সময় ভাল লাগে না।"

"ওখানকার জাহরিঙ্গেন দুর্গের খুব নাম আছে। ওখানকার চার্চটা হচ্ছে রোমান স্টাইলের। কারণ, অনেক কাল আগে তাদের হাতেই তৈরী।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে ক্ষণিকের অতিথি বিদায় নিল। আমরাও জিনিস গোছানোর জন্য নিজেদের ঘরের দিকে গেলাম।

৮

যাব জুরিখ। তল্পিতল্পা সব প্রস্তুত। হঠাৎ মতটা পালটে গেল।

মনে পড়ে গেল ছোটবেলার একটা ছবির কথা, "প্রিজনার অব জেণ্ডা।" রূপকথার দেশের রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা। সেজে ছিল স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার ও ডেবরা কার।

বলতে গেলে এও এক সত্যযুগের কাহিনী। মানে, অনেক বৎসর আগের ঘটনা। আকাশের তারা যেমন অনন্তকাল ধরে জ্বল-জ্বল করছে, সেইরকম মানুষের অতি ক্ষুদ্র জীবনের আকাশে এক একটা ঘটনা তেমনি চিকচিক করতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত।

বিশেষ কিছু বলেও নয়, আবার সামান্য কিছু বলেও নয়। মানে-শূন্য ভাবে।

ঠিক সেইরকমই এই ছবির কথাটা মনের কোণে রয়ে গেছে। মনে পড়ে, ছবিটি কচি মনটার ঝুঁটি ধরে বেশ জোরে জোরেই নাড়া দিয়েছিল।

সবাইকে জিজ্ঞাসা করে বেরিয়েছিলাম জেণ্ডা দুর্গ টা কোথায়, দেশটাই বা কোথায়।

সঠিক জবাব কেউই দিতে পারেনি। সত্যি নাম তো দেয়নি লেখক।

মনে পড়ে, কে জানি বলেছিল বোধহয় লিকটেনস্টাইন রাজ্যের কথাই লিখেছিল। নাম ভাঁড়িয়ে।

সেই থেকেই মনের আনাচে কানাচে নামটা ঘুরে বেড়িয়েছে।

তাই বলে ফেললাম, জুরিখ না গিয়ে প্রথম লিক্‌টেনস্টাইনে যাওয়া যাক। সেইভাবেই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এই দেশের কথা ভাবতে বসলেই বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ে মন ভরে যায়। পৃথিবীর ম্যাপের ওপর বলতে গেলে একটা আলপিনের মাথার বিন্দুর চাইতেও ছোট এক দেশ। তার আবার স্বাধীন রাজা। বিরাট বিরাট দেশগুলোর প্রভাবশালী রাজারা সব সাফ হয়ে গেল। কিন্তু এরা এখনও রয়ে গেছে।

শুধু রয়ে গেছে নয়, ভাল ভাবে রয়ে গেছে।

এর জন্ম হয়েছিল সাতশ শতাব্দীতে। যোহান এডাম এক অস্ট্রিয়ান রাজকুমার দুটি দেউলিয়া জেলা কিনে নেন। সতের শ তেরতে লিখিত পড়িত ভাবে লিক্‌টেনস্টাইন রাজত্বের আরম্ভ।

যোহান এডাম সে যুগের একজন খুবই অবস্থাপন্ন রাজকুমার। ইউরোপে সব চাইতে ধনীদের মধ্যে একজন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ার বেশ একটা বড় ভাগ ছিল তার।

এই ছোট্ট দেশটাকে তিনি যখন দেখেছিলেন, সেই মুহূর্তে নিশ্চয়ই কোন গ্রহ কোন একটা কারসাজি করেছিল। না হলে এক দেখাতেই কি করে এই দেশটাকে তিনি এত ভালবেসে ফেলেছিলেন।

যাক, তারপরে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। দুটি বড় বড় যুদ্ধে কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে। বিরাট দেশ, বিরাট জাত বা বিরাট মানুষ কেউই রেহাই পায়নি।

সেইরকম যোহান এডামের বংশধররাও পায়নি।

তাদের রাজ্যের নানা দিক থেকে ধনদৌলত এনে তারা তাদের ভালবাসার ছোট দেশটাকে মনের মত সাজিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যও কি তারা তখন ভেবেছিল যে এই পুচকে রাজত্বই তাদের থাকবে, বাকি সব ধুলোতে মিশিয়ে যাবে!

সবই বোধ হয় শেষ হয়ে যেত যদি সময়ে, মানে ১৯১৮তে, তারা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দিকে না ঝুঁকে পড়ত।

এখনকার রাজপুত্র আগের মত অবস্থাপন্ন না হলেও যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। ওপরওয়ালাই তাদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাই ওদের সুবুদ্ধি দিয়ে তাদের ধনদৌলত যতটা সম্ভব ওইদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল। তাতে দেশটা হয়ে গেছে অবস্থাপন্ন ও ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালাইজ্‌ড।

আর শেষ পর্যন্ত ওদেরও সব হারাবার দলে ভিড়তে হয়নি।

সব চাইতে মূল্যবান জিনিস যেটা তারা পেয়েছে তা হচ্ছে লোকেদের ভালবাসা। লোকেরা মনে করে এই রাজপরিবারই তাদের রক্ষাকবচ। মানে, এরাই তাদের সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।

সত্যিই, অবশ্য তাই। মনে প্রাণে প্রজারা যে সেটা উপলব্ধি করে তা রাজার পক্ষে কত বড় ভাগ্যের কথা।

আমরা এই রাজ্যের রাজধানী ভাডোজে গিয়ে পৌঁছালাম ভোরবেলা। সারাদিন থেকে দিনের শেষে জুরিখের দিকে রওনা হব সেই মতলব।

দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর সময় তাদেরই সবচাইতে বেশী বড় ওস্তাদ বলা যায় যারা যত কম রাত হোটেলে কাটিয়েছে।

কথাটা একটু ঘোরাল হোল। খুলেই বলি, মিনিমাম খরচে ম্যাক্সিমাম দেখা।

আমি সেদিকে বড় ওস্তাদ। জার্নিটা রাতেই বেশীর ভাগ সেরেছি। তাতে হোটেলের খরচটা অনেকটা বেঁচেছে। চুপে চুপে সেই বুদ্ধিটা সবাইকে দিয়েছিলাম।

রাইন নদীর ধারে এই ছোট্ট সমতল শহরটি বেশ লাগল। তখন মনে হোল একবার দেখে ভালবেসে ফেলার মতই জায়গা।

যে ধনী মানী রাজকুমারকে ভুলিয়েছে সে কেন আমার মত সাধারণ মেয়ের দিকে ফিরে তাকাবে? তখনই মনে হোল যে অতুলনীয় সে কাউকে ভোলায় না, তাকে দেখে সবাই ভোলে। আমিও ভুললাম।

তবে যোহান এডামের মত হাত ভরে দেবার কিছু ছিল না। তাই শুধু মনটাই দিলাম।

এখানে পৌঁছে সবার আগে যার দিকে চোখ যায়, তা হচ্ছে ভাডোজ দুর্গ। তিনশ ফুট উঁচু এক পাহাড়ের উপরে। মনে হয় সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যেন অভয় দিচ্ছে। দুর্গের ভিতরটা দেখা সম্ভব হোল না। রাজপরিবার এখানে থাকে। এই দুর্গ প্রথম বানান হয় তের শতকে। চোদ্দ শ নিরানব্বইর যুদ্ধে এটা অনেকটাই জ্বলে পুড়ে যায়। এটা এখন যা সেইরূপ উনিশ শতকে দেওয়া হয়।

এখান থেকে হেঁটে বেড়াবার সুন্দর সুন্দর রাস্তা আছে। আমরা অবশ্য বেশীর ভাগই হেঁটে না বেড়িয়ে কারে ঘুরলাম। সময়ের অভাব।

এদিক সেদিক অনেক ঘোরাঘুরি করে ওয়েগু হোটেলে খাওয়া হোল। বড় তৃপ্তির সঙ্গে। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

ঝলমলে শহর। তার মধ্যেও শুধু পায়ে চলার পথ আছে।

এক সময় মোটর ছেড়ে দিয়ে পায়ে চলার পথে অনেক ঘোরা হয়েছিল। এত সুন্দর দৃশ্য যে শুধু মনে হচ্ছিল এখানে কিছুদিন থেকে গেলে বেশ হোত। এরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই বিরল।

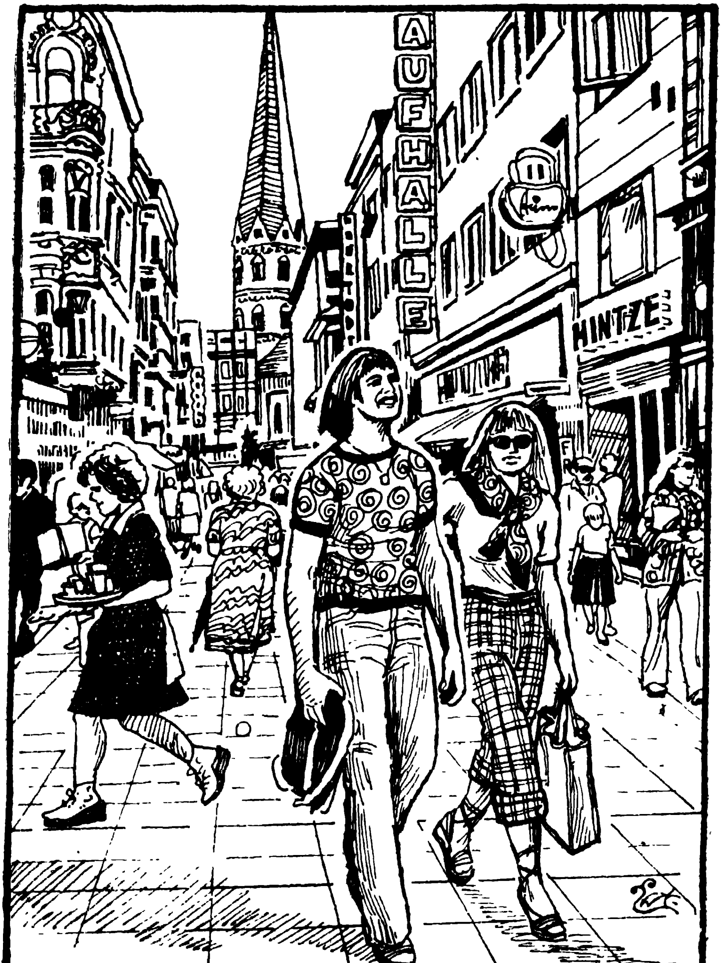
এদিক সেদিক যেতে যেতে সেন্ট মামেরটাস চ্যাপেল দেখলাম। আর দেখলাম গুটেনবার্গ দুর্গ। এটা একটা মধ্যযুগের দুর্গ।

ভেতরে অবশ্য যাওয়া সম্ভব ছিল না। এতে গৃহস্বামী সপরিবারে থাকেন। বাইরে থেকে দেখেই মধ্য যুগের স্থাপত্যের বেশ একটা ভাল ধারণা হয়।

যা চিরকাল মনে থাকবে, তা হচ্ছে লিকটেনস্টাইন গ্যালারী। এখানকার সব ছবিই বলতে গেলে রাজপরিবারের। রাজার এই বদান্যতার জন্য দেশবাসীও যেমন দেখবার সুযোগ পায় তেমনি টুরিস্টরাও ধন্য ধন্য করে।

এখানে আছে সতের শতকের ফ্লেমিশ মাস্টারদের আঁকা ছবি। রুবেনসের সতেরটি ছবি আছে। তার মধ্যে আছে শিল্পীর সন্তানগণ, আয়নার সামনে ভিনাস, তরুণীর শির। আর আছে ডিসিয়াস ম্যুরের স্মরণীয় জয় আর মৃত্যু। ভ্যান ডাইকের আছে ষোলটি পেইন্টিং।

এই ষোলটার মধ্যে থেকে দুটি নাম করা ছবির নামই বলছি, টাসিয়োর মারিয়া লুইসি আর একটি তরুণের ছবি। আরও অনেক নামী চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে। যেমন ফ্রান্‌জ হাল্‌স, ইয়ান ব্রেংখল ইত্যাদির।



ঝলমলে শহরে পায়ে চলার পথে

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সঙ্গে এদের সম্পর্কটা বড় মধুর। লিক্‌টেনস্টাইন অনেকটাই অনেক বিষয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে।

বা বলতে গেলে এক সংসারের মত চলে। সম্পূর্ণই ভালবাসার খাতিরে। ইচ্ছা হলেই আলাদা ভাবে চলতে পারে। বাধ্যবাধকতা কিছু নেই।

লিকটেনস্টাইনের প্রতিনিধি শুধু বার্ন অর্থাৎ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রাজধানীতেই আছে। অন্য সব দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ তারা রাখে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সাহায্যে। লিকটেনস্টাইন সরকারের মত ছাড়া সুইট্‌জারল্যাণ্ড সেই দেশের ব্যাপার কোন কিছুই বলে না বা করে না।

গত তিরিশ বৎসরে এই দেশটা এত ইন্‌ডাসট্রিয়ালাইজ্‌ড হয়ে গেছে যে তাদের দেশের কোন লোকই বসে নেই। এমন কি ওরা আরও বাড়াতে পারে। কিন্তু লোকের অভাবে পারছে না। ওরা মনে করে বিদেশী আনাটা বুদ্ধির কাজ হবে না।

ছবির মত দেশটা। এমন কি ওখানকার কারখানাগুলোও এমন সুন্দরভাবে বানিয়েছে যে দেখে মনে হয় অতি আধুনিক হোটেল।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত এই দেশটাও শান্তি ও নিরুপদ্রব জীবন ভোগ করে।

প্রিন্‌সের কাছ থেকে পায় শুভ নেতৃত্ব। রাজকুমার হচ্ছেন তাদের স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে নেন না কিছু, কিন্তু দেন দু'হাত ভরে। শুধু ভালবাসা পাবেন এইটুকু আশা করেন।

প্রজারা প্রিন্‌সকে যে কত ভালবাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় গরমের সময় উনিশ শ ছাপান্নতে। ঐটুকু একটা ছোট শহর ভাডোজে পনের হাজারেরও বেশী লোক জমা হয়ে রাজার জন্মদিন প্রার্থনাও জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে। আর দেশটার জন্মদিনের জন্য আনন্দ উৎসব করে।

তখনকার প্রিন্‌সের স্ত্রী জিনা যেমন মিষ্টি দেখতে তেমনই সুন্দর তার স্বভাব। প্রায়ই দেখা যায় প্রিন্‌সেস্ জিনা জিনিস কিনে ফিরছেন, এক গাদা প্যাকেট কাঁধে ঝোলানো।

মনে পড়ে, কে যেন একে নাম দিয়েছিল :

শান্তির উপত্যকা। ছোট্ট সুন্দর মিষ্টি শহর। সত্যিকারের রূপকথার রাজ্য।

৯

জুরিখে নেমেই মনের মত, মানে দামে সুলভ একটা হোটেলে ঘর পেয়ে গেলাম।

স্টেশনের কাছেই হোটেলটা। ম্যানেজারটি বেশ মাই ডিয়ার টাইপের। বয়স খুব একটা হয়নি। বিদেশী, মানে বহু দূর দেশী ও দেশিনীদের দেখে বোধ হয় মনে একটু পুলক ধরেছিল।

আমরা যখন ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিজেদের ঘরের দিকে যাব বলে ব্যাগ হাতে তুলে নিলাম, আমাদের দিকে তাকিয়ে সে যে শুধু মামুলী হাসি বিতরণ করল, তা নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, "তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এখানেই এসো। আমার ছুটির ঘণ্টা বেজে গেল। আর একজন আমার চেয়ারে বসবে। খুব খুশী হব, যদি তোমরা আমার সঙ্গে এই হোটেলে সকালের খাবার খাও। তোমাদের দেশের কথা জানতে আগ্রহী আমি।"

কথা শুনে আনন্দে মন ভরে উঠল। সত্যিই, পৃথিবীর চোখ এখন ভারতের দিকে।

"অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে কোথায় পাব?"

"এইখানেই আমি দাঁড়িয়ে থাকব।"

তিনজনে তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পালটে নিলাম। এই শহরের উপর মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। পৌঁছেই সাদর অভ্যর্থনা। কার, কজনের ভাগ্যে জোটে?

আগেই শুনেছিলাম, এদেশের লোক সরল, উদার ও বাইরের কথা জানতে আগ্রহী। হাতে হাতে তার প্রমাণ পেলাম।

খেতে খেতে কত কথাই যে হচ্ছিল।

"তোমরা ইনডিয়া থেকে আসছ, ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পেরেছি।"

"চেহারা থেকে?"

"না, চেহারা নয়, পোশাকেও নয়। পরেছ ত তোমরা সবাই ইউরোপীয়ান পোশাক।"

"তবে?" মেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"তোমাদের চলনে বা চাল চলনে।"

"কি রকম?" সে অবাক হয়ে তাকাল।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ওর কথা বলার ধরন থেকে ধরতে চেষ্টা করছিলাম, অরিজিন্যালি ও কোথাকার লোক। সুইট্জারল্যাণ্ডে বেশীর ভাগ লোকই বাইরে থেকে এসে ভেতরের হয়ে গেছে। এই দেশের এইটাই হচ্ছে সব চাইতে বিশেষত্ব।

"তোমাদের একটা পুরোনো কালচার আছে। সেটা বেশ বোঝা যায়, নিজস্ব যা তোমরা পেয়ে এসেছ বহু বহু যুগের ওপার থেকে। যখন আর কোথাও সভ্যতার আলোর রশ্মি প্রায় পৌঁছায়নি বললেই চলে। তাই অন্য দেশের পোশাক পরে থাকলে কি হবে, অন্য দেশের ভাষা বললে কি হবে, চোখ থাকলেই তোমাদের চিনতে পারবে। নূতন নবীন সভ্য দেশের লোকেদের সেটা নেই। সব কিছু তাদের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেছে। তোমরা যে দাঁড়িয়ে আছ শক্ত ভিত্তির উপরে"

আমি বোধহয় একটু সেন্টিমেন্টাল। সেই দোষটা আমাকে অনেকেই দেয়। ওর কথা শুনে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে কথা বলতে গিয়ে গলাটা যেন কেমন ধরে গেল।

এত যুগের পরাধীনতা—যে কারণে আমাদের কতদিকে কত অবনতি—তাতেও আমরা হারিয়ে যাইনি। অন্তরের অন্তস্তলে যা থাকে, তা বুঝি কোনদিনই হারায় না।

"তুমি আমাদের দেশের কথা এত জানলে কি করে?"

"বারে! আমি যে ইতিহাসের স্টুডেন্ট। তাছাড়া ছোট থেকেই

আমার চোখ পূর্বের দিকে। ওদিক থেকে যত মনীষী বেরিয়েছেন, আর কোনখান থেকে তা বের হয়নি। এমনকি, আমাদের যীশুও সেদিককারই। এর নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ আছে। এর উত্তর পৃথিবী একদিন পাবে। তখন আমরা কেউ থাকবো না। তার মধ্যে তোমাদের দেশের অতীতের কাহিনী অপূর্ব।"

"তোমার কথা শুনে কি যে ভাল লাগছে।"

অনু হঠাৎ উসখুস করে বলে উঠল, "আমি যে মাঝখানে কথা বলে উঠলাম, রাগ করলে না ত ?"

"তা কেন করব," বলে ছেলেটি মুচ্‌কে হাসল।

"আমি কি বলি, আমাদের দেশের কথা আমার অনেক জানা বাকি। তবুও ত কিছু জানি। কিন্তু তোমার দেশের কথা যে বিশেষ জানি না, তার কি হবে ? জান, তুমি যখন খেতে বললে, মা ঘরে ঢুকেই বলে উঠেছিল কার মুখ দেখে চোখ খুলেছিলাম, এমন সুমধুর আবাহন। আর বাবা গম্ভীরসে বলেছিল, দেখেই মনে হচ্ছিল শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছেলে। অনেক কিছু ওর কাছ থেকে জানা যাবে।"

হো-হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠল ছেলেটি।

"তুমি বড় সুন্দর কথা বল ত, মিস্। তোমার মা যেন কি বলে তোমাকে ডাকছিল, ঠিক ধরতে পারিনি, আ—তাই না ?"

"শুধু আ হতে যাবে কেন ? অনু। মানেটা কিন্তু দারুণ, তা জান ? অ্যাটম্।"

"ও বাবা, তাই নাকি ? আমি ত বেঁচে গেছি। আমি ত আর তোমার সঙ্গে থাকব না। বেচারা মা বাবার উপরে আবার ফেটে পড়ো না।"

সবাই হেসে উঠল।

খুশীর আমেজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওর কাছে এই শহরের ইতিহাস শুনলাম। এই শহরটি একেবারে অতি আধুনিক। অনেকের মনে হবে বুঝি কোন পৃথিবীবিখ্যাত ক্যেমার দেখছে। ভবিষ্যতের

যেন একটি নূতন যুগের মেলা। তারও ইতিহাস আছে। অনেক আগের যুগের কাহিনী আছে জেনে বড় ভাল লাগছিল।

"এই শহর সুইট্জারল্যাণ্ডের আর সব শহরের মতই পুরোনো। তাই এখানে সাবেক কালের বাড়িঘর আছে। এখানকার লিন্ডেন্হপ পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল ব্রোঞ্জ যুগের ছোট শহর। তা হবে খৃষ্টপূর্ব হাজার বৎসর। তখন অবশ্য পাহাড়টির নাম ছিল টুরিকাম। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর, মানে প্রস্তর যুগেও এই শহরের অস্তিত্ব ছিল।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, জ্ঞানী গুণীদের কথা—অনেক গবেষণার পরে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।"

"এত ভাল লাগছে তোমার কথা শুনে। আমাদের ভাগ্য যে তোমার মত একজন ইতিহাসে উৎসাহী লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।"

"সেটা অবশ্য উভয়ত। এখানে রোমানরা অনেক কাল রাজত্ব করে। তখন থেকে এই শহর বেশ বিখ্যাত হয়ে ওঠে।"

"একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করছি—ইউরোপের সর্বত্রই রোমানরা যে রাজত্ব করেছে শুধু তা নয়। সারা ইউরোপকে দিয়েছে শিক্ষার আলো।"

"তাতে কোনই সন্দেহ নেই। বার শ আঠারতে যখন বারথল্ড ভি জাহরিংগারের ডিউক মারা যান নিঃসন্তান তখন এই শহর হয়ে ওঠে ইম্পিরিয়াল সিটি।"

"কখন জুরিখ সুইস কনফেডারেশনে ঢুকল?" অনু প্রশ্ন করল।

"তের শ একান্নতে।"

খাওয়া শেষ হতেই আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। পরের দিনও সকালের খাবার একসঙ্গে খাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

প্রথমই গিয়ে ঢুকলাম সুইস্ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। ভাল লাগল দেখে। এই দেশের ইতিহাস জানতে হোলে এখানে আসা একান্তই প্রয়োজন।

ঘুরে ঘুরে মনে হচ্ছিল, জুরিখ সত্যিই পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় ইনসিওরেন্স সেণ্টার। জুরিখের একটি রাস্তার নাম "দি ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ অব সুইট্‌জারল্যাণ্ড"। এই বিরাট ও বিখ্যাত রাস্তার উপরে ও তার আশপাশে সব বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস্‌।

এখানকার অনেক বাড়িই টকটকে রঙীন, উজ্জ্বল রঙ-এ ও নানা ঢঙে তৈরী।

এইখান থেকে সোজা আমরা চলে গেলাম ব্যাংকিংএর রাজ্যে। এই শহরকে সেই জন্য সবাই জানে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাংকিং হাউস রয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, এই শহর কত জানি রাতের পর রাত জেগে লক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে। ঝড়-জল-বৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ, সুখ-দুঃখ, কিছুই তাকে টলাতে পারেনি। তাই লক্ষ্মী এখানে এসে হয়েছেন স্থির, অচঞ্চল। সাধনার কাছে সকলেই মাথা নোয়ায়। এমনকি স্বয়ং ভগবানও।

কনগ্রেসাস নামে বিরাট এক হল দেখলাম। উনিশ শ উনত্রিশে এইটি শেষ হয়। এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়।

গরমের সময় একসঙ্গেই অনেক বড় বড় কনফারেন্স চলতে থাকে। এর হলঘরটি এত বড় যে ৪,০০০ লোক একসঙ্গে বসতে পারে। ভাল ভাল রেস্টুরেন্ট আছে এর মধ্যে।

এখানে এসে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের কথা মনে পড়ল। আর মনে হোল তাঁর দয়ায় কতবার এখানে আসবার সুযোগ পেয়েছি ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনেছি। স্বাধীনতার আগে কি ছিল?

ওখান থেকে আমরা চলে গেলাম উটোতে, হ্রদের জাহাজঘাটায়। বম্বের মেরিন ড্রাইভের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ছুটির দিনে জুরিখবাসীরা এখানে আসে হেঁটে বেড়াতে। এখানেই বেড়াতে বেড়াতে কার কাছে জানি শুনলাম, উনিসফেন নামে একটি শহরতলির লোকেরা জুরিখে একটি অদ্ভুত রকম প্যারেড করে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা নানা ধরনের উদ্ভট পোশাক পরে

জুরিখের রাস্তা দিয়ে যায় লিনডেলক প্লাজ পর্যন্ত। নানারকম আওয়াজ করে ও গরুর গলার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। ডিসেম্বর মাসের ছয় তারিখে এই প্যারেড হয়। ওদের ধারণা, শীত ভয়ে পালিয়ে যাবে। বাচ্চাদের ব্যাপার।

শীত অবশ্য তার স্বাভাবিক গতিতে আসা-যাওয়া করছে যুগের পর যুগ। এইটি বলে অনেক কালের সংস্কার। আশ্চর্য লাগল শুনে, এত শিক্ষিত সভ্য দেশও সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বেশীর ভাগই অবশ্য আর নেই।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে পড়লাম যেখানে লিমাট নদীর শুরু। লেক জুরিখের যেখানে শেষ সেইখানে লিমাট ব্রীজের কাছে।

লিমাট ব্রীজ দিয়ে আমরা এসে পড়লাম পুবের দিকে বেলভিউ প্লাজে। এই জায়গাটি বলতে গেলে আনন্দের উৎস বন। অসংখ্য সিনেমা, কাফে, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, সবই এখানে রয়েছে। চারিদিকে আনন্দের জোয়ার। মন রাঙাবার সব রকম উপকরণ এখানে আছে।

আমাদের মন এমনিতেই ভরপুর—রূপসী জুরিখের রূপে আমাদের মন মেতে আছে। আর তাছাড়া সময়টা বেখদ্দে। খটখটে দুপুর। চারিদিক তাই কাঠফাটা। সাঁঝের আলো না জ্বললে ত এইখানে প্রাণের সঞ্চার হবে না।

তাই আমরা চলে গেলাম অলিগলি দিয়ে পুরোনো গিল্ড হলগুলির দিকে। বিভিন্ন হল, বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য, বণিকদের সমবায় সঙ্ঘ, পৌরসভা, টাউন হল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুয়েকটা নাম মনে আছে—তাই লিখলাম, যেমন সাফরান, রুডেন, জিমারলিউটেন, ইত্যাদি। এর কাছাকাছি বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা তিনজনে একটাতে ঢুকে যতটা সম্ভব সস্তায় ভূরিভোজন করে নিলাম। রাতে ভাল জায়গাতে ভালভাবে খাব সেই আশায়।

কাফেতে বসে গন্তব্যস্থানটি ঠিক করে নেওয়া হোল গ্রসমিন্সটার ক্যাথিড্রাল। মনের মধ্যে যদিও একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। এর ইতিহাস রক্তে রাঙানো।

বেশী দুঃখের জিনিস আমাকে বড় ব্যথা দেয়। পৃথিবীতে ঠিকই, সবই বৃথা, সবই ব্যথা।

সকলেরই এক সময় এই ভাব মনে আসে। এটা ভগবানেরই ইচ্ছা। মানুষ যদি সন্তুষ্ট চিত্ত হোত, তবে ত এই সৃষ্টি হয়ে যেত প্রাণহীন। তাই এই অশান্তি অস্থিরতা তাঁর সৃষ্টি। কারো মাটিকে আঁকড়ে থাকার আকুলতা, কারো আকাশ ছোঁয়ার চঞ্চলতা।

এই গির্জাটি ফেলিক্স, রেগুলা এবং এক্সুপেরান্টিয়াস, এই তিন সন্তের নামে উৎসর্গিত। এঁরাই প্রথম টুরিকামের লোকেদের ক্রীশ্চান করেন। অনেককাল আগের কথা। তা হবে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর ঘটনা।

তখনকার রাজা কেসিয়াস কত বড় সাংঘাতিক দানব ছিলেন যে শুধু যে তাঁদের মাথা কেটে নিয়েছিলেন, তা নয়। তার আগে তাদের মুখে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে তাঁরা নূতন ধর্ম ত্যাগ করে। তারপরে তাদের দিয়েই খোঁড়ানো কবরে তাঁদের কবর দেওয়া হয়।

এই ধরনের ঘটনা সব যুগেই হয়েছে, হচ্ছে। বোধহয় হবেও। মানুষ যে হচ্ছে অমৃতের সন্তান। তাদের মনের এই প্রবৃত্তির কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না। মনে আশা নিয়ে পৃথিবী চলছে—কোন এক সুপ্রভাতে মানুষ যে অমৃতের সন্তান, তার প্রমাণ দেবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে স্বর্গ।

তার আভাস আমরা পেয়ে আসছি যুগ যুগ ধরে। ঝড় উঠবে, তার সূচনা দিয়ে যায় ক্ষণিকের বিদ্যুতের ঝিলিক। এই বিশ্ব যে সেইরকম অমৃতলোকে পরিণত হবে তার আভাস আমরা পাই যুগ পুরুষদের যুগে যুগে আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে।

এই গির্জাটি এগার শতকে রোমানেস্ক স্টাইলে বানান। এর ওপরের দুটি টাওয়ার পনের শতকের গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন।

কিছুটা এগিয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছালাম জুরিখের পুরোনো চার্চের কাছে। তার বিরাট গম্বুজটির চূড়ায় আছে সোনায় মোড়া বড় ঘড়ি।

এই গির্জার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা চলে গেছে। তাই দিয়ে এগিয়ে গিয়েই আমরা এলাম পুরোনো রোমান দুর্গের কাছে।

ওয়েস্টমিনিস্টার ক্যাথিড্রালে গিয়ে তার অতীত যেমন মনকে করেছিল ভারাক্রান্ত, রোমান দুর্গের কাছে এসে মনের সেই মলিনতা নিমেষে গেল মুছে।

বিশেষ করে আমি মেয়ে। সেইজন্যও বোধহয় এর ইতিহাস আমাকে বিশেষ করে আশার আলো দেখায়।

এই দুর্গটি ঘিরে রয়েছে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মধ্য যুগে অস্ট্রিয়ানরা জুরিখ আক্রমণ করে। প্রবেশের মুখেই জুরিখের সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল। কিন্তু তাদের শত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ান সেনা তাদের হটিয়ে দিতে থাকে। সৈন্যরা হটে আসতে আসতে প্রায় শহরের ভিতরে এসে পড়তে থাকে।

সেই দুঃসময়ে এই দেশের মেয়েরা বর্মাচ্ছাদিত হয়ে ঢাল-তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে লিনডেন হফ নামে এক পাহাড়ের দিকে মার্চ করে যায়। পাহাড়টি শহরের মাঝখানে। প্রমীলা সৈন্যদল পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠে।

দূর থেকে অস্ট্রিয়ানরা ভেবেছিল জুরিখদের দ্বিতীয় সৈন্যদল পাহাড়ের চূড়ায় অপেক্ষা করছে। শুধু প্রথম দলটির সঙ্গেই তারা যুদ্ধ করছে। যদিও এই দলটিকে তারা নাজেহাল করে এনেছে, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ত তাদের যুদ্ধ করা মুশকিল হবে। তারাও ত বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অস্ট্রিয়ানরা এই ভেবে বুদ্ধিমানের মত ফিরে চলে যায়।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "স্ট্র্যাটেজিক্ রিট্রিট্।"

লিনডেন হফ পাহাড়ের চূড়াতে জুরিখের মেয়েদের স্ট্যাচু আছে, এই ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য। এদেশের মেয়েরা এই ঘটনাটি মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। মনে হয় মেয়েরাই শেষ পর্যন্ত দেশকে রক্ষা করেছিল।

এই যে আত্মপ্রত্যয় এই যে আত্মবিশ্বাস তাদের মধ্যে বিশদভাবে

আছে, তা তাদের প্রতিটি কাজেই বেশ বোঝা যায়। মেয়েদের ক্লাবের মেম্বাররা সামাজিক উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে।

তারা মনে করে না যে মেয়েরা শুধু পরীর মত সেজেগুজে বেড়াবে বা সুন্দর হয়ে থাকাটাই তাদের একমাত্র কাজ। তারা সুগৃহিণী হওয়ার সাধনা করে। আদর্শ মা হবার চেষ্টা তাদের আছে। তারা এটা উপলব্ধি করে, শুধু গৃহিণী হলেই চলবে না। তাত প্রাণী মাত্রেই হয়ে থাকে। আদর্শ গৃহিণী হওয়াটাই ত আসল কথা।

ঠিক সেইরকমই তারা মনে করে, প্রাণী মাত্রেরই জন্ম দেবার ক্ষমতা আছে। তাদের হতে হবে আদর্শ মা।

এইজন্যই বোধ হয়, এই সভ্য পৃথিবীর একটা বড় সমস্যা ওদের নেই। কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বলতে গেলে নেই। এই কথা শুনে মনে হোল এ যেন আমাদের দেশের মেয়েদের কথা শুনছি। শত কাজের মধ্যেও তাদের মায়ের কর্তব্যে বা গৃহিণীর কর্তব্যে কোন অবহেলা নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের সামনে যে এই কর্তব্যই সব চাইতে বড়। দেশের ভবিষ্যৎ ত তাদের হাতে। ভবিষ্যতের মানুষ ত মায়েরাই গড়ে তুলছে।

ভাবলে মনে হয়, প্রতিটি মা-ই ত এক একটি শিল্পী শিল্পীরা গড়ে প্রাণহীন মূর্তি। মায়েরা গড়ে জীবন্ত মূর্তি। এই কথাটি কি সেই ভাবে মেয়েরা ভাবে? বা ভাববার সময় ও সুযোগ পায়? দেশের লোকেরা কি সেই ভাবে চিন্তা করে, মায়েদের সব রকম সুবিধা দেয়?

জুরিখের মধ্যে বিশেষ করে এই জায়গাটি ভারী সুন্দর।

খাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। দেশ দেখতে বেরিয়ে একটি জিনিস খুব বুঝতে পেরেছি—খাবার সময় হয়েছে কি না জানবার জন্য ঘড়ি দেখবার কোনই দরকার হয় না খিদেই ঘড়ির কাজ করে সময়ে জানান দিয়ে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই যন্ত্র একদিনের জন্যও খারাপ হতে দেখলাম না।

খেতে খেতে মেয়েই বারে বারে বলতে লাগল, ইউনিভারসিটিটা

দেখে তারপর শহরের দিকে ফেরা যাবে। বুঝলাম, নিজে ছাত্রী বলে সেই দিকেই মনটা পড়ে আছে। আমাদের বয়সে মনের ধারাটা চারিদিকে পড়ে ছড়িয়ে। বিদ্যার্থীদের থাকে বিদ্যা বা বিদ্যাস্থানে। সেইটাই স্বাভাবিক, সেইটাই শুভ।

আমাদের দেশে বেশ অনেক কাল থেকেই ছাত্ররা তাদের পড়াশুনা ছাড়া আর সবেতেই আগ্রহী। তাদের নিজস্ব দিকটা ছাড়া। কলেজে বা স্কুলের সিট আটকে রেখে পড়া ছাড়া সবেতেই মেতে আছে।

একজন সত্যিকারের বিদ্যার্থীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, আর নিজেরও ভবিষ্যৎ নষ্ট।

মা যদি নিজের সন্তানের দিকে না তাকিয়ে অন্য সব কিছুতে মন দেয় তবে সই মাকে কর্তব্যজ্ঞানহীন মা বলতে হবে। সেইরকম ছাত্র যদি পড়াশুনাকে অবহেলা করে তবে তাকেও বলতে হবে একই কথা।

তাই মেয়ে যখন বারে বারে ইউনিভারসিটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, আমার ভালই লাগছিল যে সে একদিকে একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। আশা করা যায় সে অন্য সব দিকেও তাই হবে।

এখানকার বিদ্যার্থীরা বিদ্যা অর্জনের দিকেই মন দিয়ে থাকে। ইউনিভারসিটি অব জুরিখে গিয়ে যেন চোখ খুলে গেল।

এইখানে ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি আছে। এর ক্যাম্পাসে ঘুরে ঘুরে অনেক কথাই জানলাম। সুইট্জারল্যাণ্ডের সব চাইতে নামী শিক্ষাবিদ্ যোহান পেসটালোজ্জ জুরিখে জন্মেছিলেন। এদেশের সবচাইতে বড় কবি গটফ্রিড কেলারেরও জন্মভূমি এই জুরিখ।

আরও একটি বিষয়ে জুরিখ বেশ খ্যাতি লাভ করছে। সি জি জুঙ ইনস্টিটিউটে মনস্তত্ত্বের উপরে রিসার্চ চলছে। নানা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়ে গবেষণা করতে এখানে আসে।

এদিক সেদিক দেখতে দেখতে সে বলল, একটা মজার ব্যাপার

দেখেছ? যেখানে প্রাচুর্যে শুয়ে বসে বেশ দিন কাটাতে পারে সেখানেই লোকে খেটে মরছে। কতরকম গবেষণা করছে, কত কিছু করছে। বিরাম বিশ্রামহীন ভাবে। আর আমাদের দেশে অভাব অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু কিছু করব এই ইচ্ছাটাই নেই।"

"তাই হয়। কিছু করবার আকাঙ্ক্ষা নেই বলেই ত আজ দেশ এগুতে পারছে না। যেদিন কাজ করবার উদ্দীপনা আসবে, সেদিন দুঃখ দুর্দশা আসবে না। দুর্দশা ও অলসতা মনে হয় এক মায়ের পেটের দুই বোন।"

এবার আমরা ধীরে ধীরে চললাম ফিরে দিলখুস্ কেবিনে নয়, দিল খুশী করবার মত জায়গাতে।

জুরিখবাসীরা যদিও খুব নীতিপরায়ণ, কিন্তু বাইরের লোকেরা তাদের মত হবে বা চলবে তা মোটেই ওরা ভাবে না। ভাবে ভঙ্গিতে ওরা সম্ভবত বোঝাতে চেষ্টা করে, আমরা হাল্কা মেজাজের নই সেটা বোধহয় দোষ। আমরা যে এটাকে বড় গুণ মনে করি, তা ঠিক নয়। আমরা পারি না জীবনটাকে সহজভাবে নিতে। তোমরা যারা পার, তারা আনন্দ কর। "হেসে নাও দুদিন বইত নয়।"

সেইজন্য টুরিস্টদের ওখানে কোন বাধো বাধো ঠেকে না। তারা তাদের মনে আনন্দ করে ঘুরে বেড়ায়।

এই শহরে নৈশ ক্লাব যে নেই, তা নয়। নগ্ন নৃত্য মানে স্ট্রীপটীজ যে নেই, তাও নয়। সব থাকা সত্ত্বেও কেউ বলতে পারবে না যে মূলত এইটি একটি রাতের শহর। প্রকৃতি একে সাহায্য করেছে অন্য ধরনের হতে।

এই শহরটি হ্রদ বন পাহাড় পর্বতে মনোমোহিনী হয়ে আছে। এই সৌন্দর্য লোকেদের বাইরে টেনে নেয়। তাই এরা অবসর সময় খেলাধুলোতে সময় কাটায়।

রাত জাগার স্বভাব ওদের তাই কম। সম্ভবও নয়। সারাদিনের ছুটোপুটির পর সবাই চায় বিশ্রাম। তাই যদি মধ্য রাত্রের পর কেউ

কেউ রেস্টুরেন্টে বসে থাকে বা রাস্তায় হেঁটে চলে বেড়ায়, পুলিশ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক হবে।

আমরা যারা পরদেশী লোক, এসব জানার পর কি বেশীক্ষণ বাইরে থাকি? তাছাড়া সারাদিন ঘুরে ঘুরে জিরোবার ইচ্ছেটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। থ্রী মাস্‌কেটিয়ার্‌স্‌ চললাম হোটেলের দিকে।

"সৌন্দর্যের রাণী সুইট্‌জারল্যাণ্ডকে আমরা কেমন আরামে আয়েসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, তাই না?"

"আমি কিন্তু কোনদিনই ভাবিনি আমার এই ভাগ্য হবে। তুমি স্টুডেণ্ট অবস্থাতে এসেছ আর সুযোগ পেয়েছ। পরেও সুযোগ পেয়েছ। মেয়েও পাবে জানতাম। পড়তে পাঠাব। আমি সাধারণ মেয়ে, ছাত্রাবস্থায় আসিনি। পরেও আসবার কথা নয়। সেই আমি আজ এখানে। এত ভাল লাগছে ভাবতে। গড ইজ গ্রেট্‌।"

১০

"সুপ্রভাত", হেসে ম্যানেজার চেয়ারটা টেনে দিল বসবার জন্য। "কি কি দেখলে আর কি কি কিনলে?"

"প্রথমটির উত্তর হচ্ছে অনেক কিছু; দ্বিতীয়টির কিছু না।"

"কিছু না কেন? খুব হিসেবী ত।"

"হিসেবী? বেহিসেবী বল। সামান্য রেস্ততে এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইউরোপ দেখছি ও দেখব। প্রতিটি পেনি শেষ করে যাব। সঞ্চয় কিছুই করব না। সঙ্গে কিছুই নেব না। মনটাকে নিয়ে যাব সবকিছু ভরে কুলুপ দিয়ে। তার জন্য লাগবে না কাস্টমস্‌ বা আর কোন মাশুল। প্রবলেমও হবে না।"

"ঠিক বলেছ। খুব বুদ্ধি করেছ ত। সব এমন ভাবে নিয়ে যাবে যে কেউ কিছু করতে পারবে না বা বলতে পারবে না। সবাইকে ঠকিয়ে অনেক কিছু নিয়ে যাবে।"

"এ ভীষণ বুদ্ধিমতী। কেউ কোনদিন একে ঠকাতে পারবে না", সে বলে উঠল।

"মার সব সময়ই অভিনব ঠকাবার পদ্ধতি।"

"আমিও কিন্তু তোমার কাছ থেকে এই ঠকাবার বিদ্যাটি শিখবার চেষ্টা করব।"

এইভাবে আমাদের বেশ জমে উঠল।

"জান, কালকে আমরা গ্রসমিনস্টার চার্চ দেখলাম। তার ইতিহাস একটু কিছু জেনেছি। সবটা নয়। তুমি বল না।"

"বেশ, শোন। উলরিচ্ জুইংলি নামে এক বিরাট ধর্মযাজক এই দেশে প্রথম প্রটেস্টেন্ট ধর্ম প্রচার করেন। পনের শ উনিশ থেকে পনের শ একত্রিশ—উনি এই ধর্ম গির্জায় প্রচার করেন।"

'ওঁর স্ট্যাচু দেখলাম। মুখে ফুটে উঠেছে পবিত্রতার আভাস।"

"ঠিকই বুঝেছ। ওঁর জন্যই এখানকার লোকেরা বেশীর ভাগই নীতিপরায়ণ। উচ্চ মানের জীবনযাত্রা। পয়সার দিক দিয়ে শুধু নয়, মনের দিক থেকে।"

এই শহরের নাম জুরিখ না হয়ে জুইংলি হলে বেশ হোত। জুইংলি নামের মধ্যে একটা বেশ ছন্দ আছে, অমু বলে উঠল।

ছেলেটির মুখটা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। "তা হতে পারে, তবে শ্রদ্ধার পাত্রের নামটা যেত খেলো হয়ে।"

মা-মেয়েতে চোখাচোখি হয়ে গেল।

"সেটা খুব ঠিক বলেছ। আমি না ভেবেই বলেছিলাম," অমু বলল।

ছেলেটি হেসে কথায় মোড় একেবারে ঘুরিয়ে নিল।

"অমু, তোমাদের আমাকে মনে থাকবে? আমার থাকবে।"

"আমাদেরও থাকবে। দেশটা ত বিদেশ, সেখানে কেমন আমরা আপন লোক পেয়ে গেছি।"

সেদিন আর গল্প করবার সময় ছিল না। টিকিট কাটা আছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে জুগ আর এনসীডেলনের উদ্দেশে। জুরিখ থেকে বেশ কিছু দূরে।

ট্রেনে বা বাসে যাওয়া যায়। আমরা বাসেই গেলাম, তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে বলে। অনেকটাই যাওয়া হোল জুরিখ লেকের ধার দিয়ে। ভারী সুন্দর দৃশ্য।

পশ্চিম দেশের একটি বিশেষত্ব চোখে পড়বেই। ঈশ্বরের দেওয়া দান তারা মাথায় করে নিয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা তিনি দিয়েছেন তার অমর্যাদা তারা করেনি সেই সৌন্দর্যকে তারা যত্নে। স্নেহে আরও সুন্দর করে তুলেছে ও রেখেছে। এইদিক দিয়ে আমরা তাদের কাছে সত্যিই অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারি, শিখতে পারি।

জুগ্ একটি প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন শহর। ওখানকার গথিক স্থাপত্যের মধ্যযুগের টাউনহলটির মধ্যে মিউজিয়ামটি দেখে বেশ লাগল। ওখানে রয়েছে কাঠের উপরে কাজ করা নানা জিনিস, পেইন্‌টিংস, সোনারুপোর উপরে সূক্ষ্ম কাজ করা বিভিন্ন ধরনের জিনিস, আরও অনেক কিছু। এসব থেকে তাদের আগের যুগের শিল্পকলার বেশ একটা ধারণা হয়ে যায়।

একটা বিশেষ জিনিস সত্যিই চোখে পড়বার মত। তা হচ্ছে একটি পতাকা বড় সযত্নে রাখা।

কত যুগ আগে মিলানিজ আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। তিন হাজার সুইস্ সৈন্য যুদ্ধ করেছিল চব্বিশ হাজার মিলানিজ সৈন্যের বিরুদ্ধে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পিয়ের কলিন এই পতাকাটি ধরে রেখেছিল মাথার উপর।

এই কথাটি জেনে মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ স্টেটের মেদিনীপুর জেলাতে মাতঙ্গিনী হাজরা আমাদের তেরঙ্গা পতাকা মাথার উপরে তুলে রেখেছিলেন। ইংরেজদের পুলিশের লাঠিতে ও গুলিতে যখন তাঁর প্রাণহীন দেহটা রাস্তার ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়েছিল, তখনও তাঁর হাতে পতাকা উঁচু করে ধরা।

সেই মুহূর্তেই স্বাধীনতার ক্ষণটুকু নির্ধারিত হয়েছিল।

এখন সেই জায়গাতে এই বীরাঙ্গনার মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। যাতে ভারতের মেয়েরা বুঝতে পারে স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের দান সমান।

যারা ভয়াবহ জায়গায় যেতে ভালবাসে তাদের জন্য এখানে একটি বিশেষ জায়গা আছে। আমরা ওখানে যাইনি। যারা যেতে চায় তাদের সুবিধার জন্যই লিখছি। কবর খুঁড়ে অনেক আগের যেসব কঙ্কাল বের হয়েছিল, তার থেকে বাছাই করা একশটি সেণ্ট মাইকেল গির্জার একটি ঘরে রাখা আছে। এরা কারা ছিল সেইসব লেখা আছে।

জুগ্ থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম এন্‌সীডেলন। এই জায়গাটি তিনটি বিষয়ের জন্য বিখ্যাত।

রেনেসাঁস যুগের বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাসেলমাস এইখানে জন্মেছিলেন। বেনেডিকটাইন মনাস্ট্রীতে রয়েছে কৃষ্ণবর্ণ ম্যাডোনার মূর্তি। কিংবদন্তী আছে, এই মূর্তিটির কৃপায় অনেক অসুখ সেরেছে ও সারে। এই বিশ্বাসের জন্য বছরে প্রায় বিশ হাজার তীর্থযাত্রী এখানে আসে।

পশ্চিমের দেশে এই ধরনের ব্যাপার অতি বিরল। অনেক অনেক আগে আমাদের দেশের মত তারাও অন্ধবিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। এখন তারা আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। তারা অন্তরের অন্তস্তলে বিশ্বাস করে, "সোহং," তুমিই আমি, আমিই তুমি।

আমাদের অনেক কুসংস্কার চলে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরাও আত্মবিশ্বাসে হব আস্থাবান।

এখানে আরও একটি কথা জানলাম। ডন পেড্রো কালডেরন নামে একটি স্প্যানিশ নাট্যকার "দি গ্রেট ওয়ার্লর্ড থিয়েটার" নামে একটি ভাবপ্রবণতাপূর্ণ নাটক লেখেন। এই নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয়। এই ড্রামাটি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এখানে দেখানো হয়।

জুরিখের গ্রস্‌মিনিস্টার মঠ যে সময় স্থাপিত হয়, সেই সময়কারই এইখানের মনাস্টারিটি। মাইনরাড নামে এক কাউণ্ট পরে সাধু হয়ে যান। অনেক জায়গা খোঁজার পর এই শান্ত নিস্তব্ধ জায়গাটি তাঁর পছন্দ হয়। ছোট একটি মঠ বা ঠাকুরঘর করে তিনি এখানে

থাকতে আরম্ভ করেন। এখানে খাবার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। দুটি দাঁড়কাক, কে জানে কোথা থেকে, রোজ এই সাধুটির জন্য খাবার নিয়ে আসত। সন্ন্যাসী শান্তিতে শান্ত পরিবেশে দিনের পর দিন সমাধিস্থ থাকতেন। কিছু অসৎ লোকের ধারণা হয় সাধুটির নিশ্চয়ই অনেক ঐশ্বর্য আছে। তাদের হাতে একদিন সাধুটির মৃত্যু হয়।

সেই দুটি দাঁড়কাক কিন্তু হত্যাকারীদের পিছু ছাড়ে না। খুনীরা জুরিখে পালিয়ে যায়। কিন্তু দাঁড়কাকরা তাদের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অল্প সময়ের মধ্যেই লোকেদের নজরে পড়ে। ধীরে ধীরে আসল কথা বেরিয়ে পড়ে ও খুনীদের মৃত্যুদণ্ড হয়। ধর্মের কল বাতাসে ওড়ে।



ধর্মের কল বাতাসে ওড়ে

মাইনরাডের কবরের উপরে এই গির্জাটি স্থাপিত হয়। এর

দরজা খুলে দেন বিশপ নয় শ ছেচল্লিশে এবং সন্ন্যাসী যে মূর্তিটির পুজো করতেন সেইটি এর ভিতরে রাখা হয়।

মূর্তিটি হচ্ছে কালো পাথরের ম্যাডোনার। একটি কথা জেনে খুবই অবাক লাগল। বারে বারেই এই মঠটি নানা ভাবে ধ্বংসের মুখে গেছে বা প্রায় ধ্বংসই হয়েছে, কিন্তু মূর্তিটি অক্ষত রয়ে গেছে।

এখন এটি রাখা হয়েছে বড় মঠের মধ্যে একটি ছোট কাল মার্বেল পাথরের তৈরী গির্জার মধ্যে। উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। মূর্তিটি দেখা যায়, কিন্তু কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে মনে হয়, অনেক দামী গয়না পরা।

মঠের সামনে ভারী সুন্দর বিরাট একটি ঝরণা রয়েছে। এইখানে আরও একটি ভার্জিন মেরীর কাল পাথরের মূর্তি আছে। এই ঝরণার জল পড়ছে চোদ্দটি মুখ দিয়ে।

কিংবদন্তী আছে যীশুখৃষ্ট-এর একটি থেকে জল খেয়েছিলেন। তীর্থযাত্রীরা তাই প্রতিটি মুখ থেকেই জল খায়। যীশু কোনটি থেকে খেয়েছিলেন জানা নেই ত। এত সহজে পুণ্যলাভ করবার রাস্তা কে ছাড়ে?

আমাদের দেশেও তাই। পুণ্যার্থীরা বৃন্দাবন গিয়ে রাস্তার ধুলো মাটি মাথায় ও গায়ে মাখে। কোন যুগে শ্রীকৃষ্ণ এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন। তাঁর পদরেণু মাথায় দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করে আনন্দিত চিত্তে ঘরে ফেরে। কেউ জিভে ঠেকিয়ে কলেরায় ইহধাম ত্যাগ করে।

পুণ্যের ফলে সে গোলোকে যায় বা নরকে যায়। তার খবর কেউ জানে না সেটাই বাঁচোয়া।

আমার বৃন্দাবনে গিয়ে এই কথাটাই বারে বারে মনে হয়েছে যে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে চিরকালই নিজের চাইতে কম বুদ্ধিমান মনে করেছে। এত সহজেই যদি তাঁকে তুষ্ট করা যেত তবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করতেন না; আমরাই তাঁকে করতাম।

তাছাড়া, এই পৃথিবী তবে এতদিনে স্বর্গরাজ্য হোত আর দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মানুষ কবেই রেহাই পেত।

সেইখান থেকে আমরা চলে গেলাম জুরিখের শিল্পসমৃদ্ধ জায়গাটিতে। উইনটারথারে গিয়ে প্রথমই আমরা গেলাম দি অসকার রাইনহার্ড ফাউনডেশনে এবং পাবলিক আর্ট গ্যালারীতে।

সেখানে আমরা দেখলাম সুইস্ জার্মান ও অস্ট্রিয়ান পেইন্টিংস।

তাছাড়া, ওখানে আছে চারটি দুর্গ। সেদিকে আর আমাদের যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই সোজা ফিরে এলাম জুরিখে, মানে হোটেলে।

সকালে উঠেই ইলেকট্রিক ট্রেনে করে আমরা চলে গেলাম সেন্ট গ্যালেন বলে একটি ছোট আধুনিক শহরে। মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ। মধ্যযুগে গ্যালাস নামে এক আইরিশ পাদ্রী একটি ছোট মঠের সূচনা করেন ধীরে ধীরে সেটি ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে পরিণত হয় ও শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যমণিতে পরিণত হয়। মঠাধ্যক্ষই এই শহরের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন বেশ কিছুদিন।

পনের শতকে দেশবাসীদের চেষ্টায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। মঠাধ্যক্ষের প্রাসাদটি এখন এখানকার পার্লামেণ্ট ও সরকারী অফিস হয়েছে।

এখান থেকে আমরা গেলাম মারকেট প্লেসে। সেখানে ভাদিয়ান নামে একজনের স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ইনি এইখানে প্রথম প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম প্রচার করেন। দুপুরের খাওয়াটা আমরা সেরেছিলাম কাফে পুগেতে। অনেকেই বোধহয় ভাববেন এর খাবার জায়গার নামগুলো এত মনে রইল কি করে? নিশ্চয়ই ভোজনে সুরসিকা।

খেতে সকলেই ভালবাসে, তার উপর যদি বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রুচির খাবার জোটে। নূতন জিনিস, নূতন দেশ, মানে নূতনের মোহে কে না পড়ে?

মানুষের স্বভাব তাই। সেইজন্যই বোধ হয় আর সব নূতনের

সঙ্গে নূতন পরিবেশে খাওয়া বা খাবার জায়গাগুলোর কথা এত মনে আছে।

আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। যাঁরাই দেশবিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই বুঝবেন, ঘুরে ঘুরে কি প্রচণ্ড খিদে পায়। সেইজন্যও বটে এই বিষয়টি বেশ বিশেষ হয়ে ওঠে।

এর পরে আমরা রওনা হলাম আপেঞ্চল নামে একটি শহরের উদ্দেশে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ত পৌঁছে গেলাম ইলেকট্রিক ট্রামে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই শহরটি একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল। আসা-যাওয়ার সুবিধা একেবারেই ছিল না। তাই বোধ হয় এখনও পুরাকালের আচার-বিচার অনেকটা চালু আছে।

এখানকার একটি রীতি যা এখনও চালু আছে, মনে হয় না আর কোথাও তা আছে। আমি ত কোথাও পড়িওনি শুনিওনি। তবে এটা ঠিক, কতটুকুই বা আমি জানি।

প্রতি এপ্রিল মাসে একটি বড় মাঠে বা খোলা জায়গাতে সকলে এসে হাজির হয়। বাজেট, ট্যাক্স সংক্রান্ত ব্যাপার, রাজ্য চালনা, ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেকেই আই বা নাই বলে নিজেদের অভিমতই শুধু নয়, এইভাবে রাজ্যশাসন চলবে কি না তা ঠিক করে। কারা ক্ষমতাসীন থাকবে বা হবে, তাও ঠিক হয়। যাকে বলে সরাসরি গণতন্ত্র। মানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র নয়।

সেইদিন সকলেই তলোয়ার হাতে নিয়ে যায়। তাদের যে ভোট দেবার অধিকার আছে, তাই এতে প্রমাণ হয়।

মেয়েরা সেইদিন জাতীয় পোশাক পরে সেজেগুজে যায়। কাছাকাছি আরও একটি জায়গাতে গিয়েছিলাম। নামটি ঠিক মনে নেই। কিন্তু ওখানে যা দেখেছিলাম, চিরকাল তা মনে থাকবে।

সেখানে আঠারটি বাড়িতে বিভিন্ন দেশের ছুশো বাপ-মা মরা বাচ্চাদের রাখা হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইটালী, ফিন্ল্যাণ্ড, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড ও সুইট্জারল্যাণ্ডের। তাদের একভাবে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে একটি বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্ক্তির কথা মনে হোল :

"এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

এইখানে সামান্যভাবে যে চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা কত আগে উপলব্ধি করেছিলেন। এই ধ্যান ধারণা তিনি পেয়েছিলেন আমাদের দেশের ইতিহাস থেকে। বিভিন্ন দেশবাসী, বিভিন্ন ধর্মী, সকলেই এই দেশে এসে এক হয়ে গেছে। এতবড় সংমিশ্রণ কেন্দ্র আর কোথাও বোধহয় নেই। তাই ভারতবাসীরা চেহারায় একে অন্যের থেকে বেশ তফাত।

স্বাধীনতার পরে আবার ভারত সবার দিকেই দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই জায়গাটি সত্যিই শস্যশ্যামলা। তাইত সুইট্জারল্যাণ্ডের মধ্যে এখানকার লোকের মাথাপিছু আয় সবচাইতে বেশী।

জুরিখ দেখার উপর এখান থেকেই দাঁড়ি টানলাম। চললাম ফিরে যেখান থেকে এসেছিলাম।

জুরিখে পৌঁছে মনে হোল, এই ত আমার দেশ। সারা পৃথিবীই ত আমার দেশ। ক্ষণিকের জন্য হলেও নিখিল সংসার পরম বন্ধুভাবে মনে হয়।

তার কারণ ক্ষণস্থায়ী বাসা ভেঙে চলে যেতে হবে ভাবলেই এই চিন্তা এসে দুঃখের ছায়া ফেলে মনে।

১১

বাজল। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে ঘুম ভাঙল।

তখন উষার উদয়ক্ষণ না হলেও বিদায়ের মুহূর্ত ত বটেই মনে হোল এই শহর কি হাত বাড়িয়ে দেবে আমার দিকে ?

যে অপ্রত্যাশিত আবাহন পেয়েছিলাম জুরিখে তা আশা করি না তবুও ত।

এখানে আসবার আগেই এই দেশের কথা কিছু জেনে নিয়েছিলাম। লোক মুখে বা বই পড়ে।

যখনই বই পড়ি মনে হয় আমরা কত ভাগ্যবান। অনেক আগের যুগে আমার মত সাধারণ লোকেরা কিছু জানতে পারত না। হাতে লেখা পুঁথি পড়বার সুযোগ ক'জনের হতে পারে। সীমাবদ্ধ ছিল।

ঠিক লক্ষ্মণের গণ্ডি টেনে দেবার মত। গণ্ডি পেরিয়ে সীতাদেবী কি বিপদের মধ্যেই না পড়েছিলেন। সেই কাহিনী সকলেই জানে। মনে হয়, তাই সাধারণেরা ছকে আঁটা রাস্তা দিয়েই করে বিচরণ। কে চায় অযথা ঝামেলা মাথায় নিতে?

অসাধারণরা ত সেই কথা মানতে চায় না। দুর্বার গতিতে সেই টানা রেখার বাইরে বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়েও পড়ে।

বেশীর ভাগই আছড়ে পড়ে বাধা বিপত্তির মুখে। দু-এক জনই সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

সেই রকম ভাবেই একজন বের করেছিলেন এই জাদুমন্ত্র, "চিচিংফাঁক"। সব জানবার সব বুঝবার দরজা খুলে গেল। আর সাধারণের থেকেও সাধারণ মানুষ সব জানল। ছাপানো বই পড়ে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই শহর দুভাগে ভাগ করা। গ্রেটার বাজ্‌ল, এদিকটাই হচ্ছে বাণিজ্যকেন্দ্র। তাছাড়া বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও বিদ্বান ব্যক্তিরা বেশীর ভাগই এপাশটাতে থাকে।

তাই গ্রেটার বাজ্‌লে গড়ে উঠেছে শহরের ওপরতলার লোকেদের যা লাগে সবই। ওপরতলায় মানে, যাদের শুধু টাকার জোর আছে তারা নয়। মাথা এবং টাকা দুটোরই দরকার। বিশেষ করে মাথার জোর। গ্রেটার বাজ্‌লকে ওরা বলে গ্রস বাজ্‌ল।

অন্য দিকে হচ্ছে ইনডাসট্রি। এর নাম হচ্ছে, ক্লেইন বাজ্‌ল। ওদিকের লোকেরা আবার রাইন নদীর এপারের এই বাজ্‌লের

লোকেদের একটু খাটো ভাবে দেখে। যদিও সবাই জানে নূতন যুগে ইনডাসট্রিই দেশকে বড় করবার বলতে গেলে সব চাইতে বড় সহায়ক।

ঠিক যেমন আমাদের দেশে শহুরেরা খেতখামারের লোকেদের অবহেলার চোখ দেখে। যদিও খেতখামারের লোকেরাই আমাদের বাঁচবার উপকরণ যুগিয়ে আসছে। না হলে আমরা প্রাণে বাঁচব না।

প্রথমেই মনটা চাইল কুনস্ট মিউজিয়ামে যেতে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে দিলাম পা চালিয়ে। মনসা মথুরাং গচ্ছামির মত মনে মনে অবশ্য পৌঁছে গিয়েছিলাম আগেই। বড় বড় চিত্রশিল্পীর আঁকা অনেক ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠল।

নিখুঁতভাবে কি আর মনে থাকে? তাই বারে বারে দেখলেও তা পুরোনো হয় না। চিরনূতন থেকে যায়। মনে হয় এই তুলির আঁচড় এভাবে গেছে। কিন্তু আবার দেখে বুঝি মন ঠকিয়েছে; সেভাবে যায়নি। আমি আঁকতে শিখিনি, কিন্তু ভালবাসি। তাই বোধ হয় এই ভুলটা হয়।

কখনও কখনও মনে হয় শুধু ভালবাসাটাই ভাল; না জানাই ভাল হয়েছে তাইত ভুলে ভুলে নিত্য নূতন ভাবে মনে আসে। বলতে পারেন এ হচ্ছে অক্ষমের সান্ত্বনা।

এখানে রয়েছে ফ্লেমিশ জারমান ও বাজ্‌লের চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি। মধ্যযুগের ও রেনেসাঁসের প্রথম দিককার। অনেক পেন্টার এই দেশে থেকে এঁকেছেন।

কনরাড ভিটজ চোদ্দ শ-পঁয়ত্রিশ থেকে চোদ্দ শ-ছেচল্লিশ পর্যন্ত এখানে বাস করেছেন ও ছবি এঁকেছেন। তাছাড়া আরও অনেকের আঁকা ছবি আছে। আমি দু-এক জনের নামই করব, হলবীন ভ্যানগগ মাতিস্ ফ্রাংক বুশের ইত্যাদি।

বিশেষ করে এখানে রয়েছে অমূর্ত চিত্রকলা। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বুঝতে হলে কিছুটা এলেম থাকা দরকার। আর্ট ফর আর্টস সেক কথাটা বোধ হয় এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না। তাই আমা হেন এই বিষয়ে না পড়া ব্যক্তির সত্যিই অসুবিধা হচ্ছিল।

একটা ব্যাপার মনকে বেশ নাড়া দিল। কোন কিছু ভালবাসলে সে বিষয়ে নিখুঁতভাবে শিক্ষা না থাকলেও ভাল লাগে।

প্রথম ভেবেছিলাম, যে জিনিস বুঝি না তাতে সময় নষ্ট না করে নিমেষে শেষ করে দেব। কিন্তু হোল ঠিক উল্টো।

এই বিশেষ ধরনের চিত্রকলার বিষয়ে কোন কিছু না জেনেও একটি ছবির দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারলাম না। দেখতে দেখতে কেমন যেন অব্যক্ত আনন্দে মন ভরে উঠল। কেন বুঝতে পারলাম না।

এইখানে অনেক আগের চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিও আছে। একটু এগিয়েই দেখলাম দেশপ্রেমিক যারা অনেক বৎসর আগে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের স্মৃতিচিহ্ন চারিদিকে। চোদ্দ শ ছেচল্লিশে ষোল শ সুইস যুদ্ধ করেছিল চল্লিশ হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে।

এই দেশে, মানে সুইট্জারল্যাণ্ডে, দেশকে যারা কোন না কোন দিক থেকে কিছু দিয়েছেন তাদের স্মৃতিচিহ্ন চারিদিকে। এরা বোঝে দেশের কাছ থেকে শুধু দুহাত ভরে নিলে চলবে না। হাত উপুড় করে করে দিতেও হবে। সুখ দুঃখ আশা নিরাশা ধন মান এমন কি প্রাণ। সব দিতে হবে এই সত্য তারা সকলেই উপলব্ধি করে। শুধু তাই নয়, নিজেদের জীবনকে সেই ভাবে চালিত করে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে এই মন অনেকের আছে, সকলের নয়। যেদিন সবাই নেবার বেলা শুধু ঋণী না হয়ে দেবার বেলাতেও হাতের মুঠি খুলবে, মনের দুয়ার খুলবে সেদিনের ভারতলক্ষ্মীর হাসিভরা মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

বিদেশে থাকলে বোধ হয় এই হয়। দেশের প্রতি ভালবাসা বেশী হয়। সবার কি তা হয়? জানি না।

এখান থেকে আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম। শুধু দেখবার জন্য নয়, তার চাইতেও মহৎ কাজের জন্য অর্থাৎ খাবার জন্য। একটা কথা আছে না আত্মনি তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। জগৎ তুষ্ট কিনা ঠিক জানি না, তবে তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠবার পরে মন মেজাজ সবই ভাল থাকে।

ঠিক সেই সময় কেউ যদি কিছু চায় মনে হয় বেশীর ভাগ মানুষই না করতে পারবে না।

শুনেছিলাম ওখানকার কাফের লাঞ্চ অতি উপাদেয়। দেখলামও তাই।

ইউরোপের মধ্যে এই চিড়িয়াখানার খুব নাম আছে কাছাকাছি অনেক কটি মিউজিয়াম আছে। কুন্‌স্টহল অথবা মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারীতে আর ঢুকলাম না।

কিছু নিতে হবে, কিছু ছাড়তে হবে। সময়ের অকুলান। এটি পড়ল ছাড়ার তালিকায়। সেই তালিকা আরও লম্বা হোল যখন আমরা বারফুসের প্লাট্‌জের মিউনিসিপাল ক্যাসিনোকে আর তার রেস্টুরেন্টকেও ছেড়ে গেলাম।

যদিও তার মিঠে মিউজিকের আওয়াজ হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, মনে মনে বলতে হোল "হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।"

এই ভাবে আমরা ইতিহাসের মিউজিয়ামকেও ছাড়িয়ে গেলাম। অতীতের কঙ্কাল বা হাড়গোড় দেখে কি হবে।

এখান থেকে সোজা চলে গেলাম বিকিকিনির জায়গাতে। ফ্রীস্ট্রাসে নামে রাস্তার উপরই হচ্ছে এখনকার বড় বড় দোকানপাট। পকেট যদিও ঢুঢু কোম্পানী।

কিনবার মুরোদ নেই তাতে কি হয়েছে? দেখবার ত রয়েছে। দেখতে ট্যাক্সও লাগে না। পয়সাও লাগে না। পকেটে আধলা নিয়ে লক্ষ টাকার চোখ ঝলসানো জিনিস দেখাটা মারে কে?

ভগবান এই এক অমূল্য ধন যা মানুষকে দিয়েছেন তার দাম কে বোঝে?

ওখানে সুন্দর সুন্দর অজস্র রিবন দেখলাম যা এর আগে চোখে পড়েনি। পরে জানলাম রিবনের জন্য বাজ্‌ল প্রসিদ্ধ।

বিকিকিনির জায়গাতে এসে চোখ ঝলসে গেল। কত জিনিস কি সুন্দর আর কি অপূর্ব ভাবে সাজানো।

একটি কথা এইখানে না লিখে পারছি না। ভগবান যদিও এ দেশটিকে বলতে গেলে সৌন্দর্য ছাড়া কিছুই দেননি।

তবে দেশবাসীকে সুবুদ্ধি দিয়েছেন মন খুলে। এদের সব কিছু কিনতে হয় অপরের কাছ থেকে, এমনকি প্রাণধারণের প্রতিটি কণা।

সেই দেশ আজ কমলাকে স্থায়ী কমলাসনে বসিয়ে রেখেছে। শুধু বুদ্ধির জোরে।

এই দেশটি একটি উচ্চমানের শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ। কি করে তা সম্ভব হোল? ঢাল নেই তলোয়ার নেই, যাদের কোন কিছুই নেই?

প্রতিটি কাঁচা মাল তাদের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। বুদ্ধি দিয়ে এরা তাই এমন সব জিনিসই তৈরী করছে যাতে মাল মশলা লাগে কম।

দরকার শুধু সূক্ষ্মকাজের, পরিশ্রমের এবং যা আনবে বেশী পয়সা তার।

কি রকম বুদ্ধি বলুন ত?

এদের এমনি দুরবস্থা যে গরুর খাবার শুকনো ঘাস থেকে আরম্ভ করে কয়লা লোহা প্রত্যেকটি জিনিস বাইরে থেকে কড়ি ফেলে আনতে হয়।

আমি পুরো সুইট্জারল্যাণ্ডেরই কথা বলছি। তাই এদের সর্বত্রই ছোট ছোট কারখানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

শহরগুলো তাই বলে কি রয়েছে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াশা চেহারা নিয়ে? বা ছন্নছাড়া বিষাদ হতাশার প্রতিমূর্তি হয়ে?

এমন কি আমেরিকা বা ব্রিটেনের মত ডেভেলপ্ট দেশের লোকেরাও বুঝতে পারে না কখন তারা ইনডাস্ট্রীয়্যাল বেল্টের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে।

মানুষের বসবাসের জায়গা ও ইনডাস্ট্রীয়্যাল বেল্টের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সবই এক রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে। তফাতের মধ্যে হচ্ছে শিল্পের জায়গাতে কিছু বড় বড় বিল্ডিং আছে।

এর কারণ একটি। এই দেশে সবই বিদ্যুৎচালিত।

লতাপাতা ফুলে ঘেরা এই সব কারখানায় কার না মন যায় কাজে? তাই বোধহয় এখানকার কর্মীরা ফাঁকি কথাটি শেখেনি! অমনোযোগী হওয়াটা বোঝে না।

যেদিন আমাদের দেশে মানুষ এই পরিস্থিতিতে থাকতে সুযোগ পাবে সেদিন কি তারা না বদলিয়ে পারে?

আমাদের দিল্লি শহরকে তাই মনে হয় অনেক বেশী কর্মচঞ্চল। লোকেরা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে না। কোথাও যাবার জায়গা নেই, কিছু করবার নেই তাই পথে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে বসে কথা বলে সময় কাটানো নয়—সত্যিকারের কাজে ও চিন্তায় ব্যস্ত।

জুরিখ ও বাজ্‌লে বেশ কিছু ইনজিনিয়ারিং ভারী শিল্প আছে। সেগুলো তারা করেছে শহর থেকে অনেক অনেক দূরে। মানুষের বাসস্থান থেকে বেশ দূরত্ব রেখে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

সেখানে কিছু কয়লায় চালিত কারখানাও আছে। কেমিকেলের কারখানা কখনো কখনো কয়লায় চালিত হতে হয়। তার ধোঁয়া লোকেরা দেখে দূরদূরান্ত থেকে আকাশের গায়ে মেঘের কোলে মেঘের মত নানারূপে রেখায় চিত্রিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"আচ্ছা তুমি পার বাবা, একটি কপর্দকও না খসিয়ে কেমন প্রাণ ঢালা আনন্দে দেখে যাচ্ছ সব"—সে বলল।

"কেনাতেই যে শুধু আমার আনন্দ তা নয়। সেটা ত গৌণ। সুন্দর সুঠাম জিনিস দেখলে আমার প্রাণ হয় তৃপ্ত। কার ঘরে গিয়ে কি সুন্দর ভাবে ব্যবহার হবে সেই ভাবনা আমাকে বেশ চঞ্চল করে তোলে। মেয়ের বা ছেলের বিয়ের সময় যেমন সকলের মনে হয় উপযুক্ত বর বা ভাল বৌ যেন পায় সেই রকমই যারা এই সব বানায় তাদের মনের কোণে নিশ্চয়ই এই ভাবনাটা আসে।

তাইত এখানকার কর্মীরা এত মন দিয়ে কাজ করে। তাদের হাতে গড়া জিনিস যেন উপযুক্ত ঘরে পড়ে, যত্নে থাকে। তাদের ভাবনাতে আমি একটু ভাগ বসাচ্ছি। আর কিছু না। চল এবার এগিয়ে যাওয়া যাক।

ষোল শতকের টাউন হল চোখে পড়ল। না থেমে আমরা এগিয়ে চললাম নিউ ইউনিভারসিটির দিকে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেনেসাঁস যুগের স্বনাম ধন্য অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ইউলার বেরিয়েছিলেন। আরও অনেক মনীষী ও সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় উজ্জ্বল করেছিলেন।

বাজ্‌লে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বারে বারেই মনে হচ্ছিল কি ঐশ্বর্যপূর্ণ ঝলমলে শহর। হবে নাই বা কেন? সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অর্ধেকের বেশী ক্রোড়পতিরা হচ্ছে এই দেশের। এটা হচ্ছে চলতি ধারণা। গুণে ঠিক নয় অবশ্য।

এই চলতি কথা থেকেই বোঝা যায় দেশের ধনকুবেরদের সংখ্যা বড় কম নয়।

এখানকার লোকেদের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের ধনের আধিক্যের কথা তারা হৈচৈ করে দেখিয়ে বা বুঝিয়ে বেড়ায় না।

এদের চলাফেরা থেকে বেশ বোঝা যায় এরা হচ্ছে বংশানুক্রমে বড়লোক। ব্যাংকিং ও ইনসিউরেন্সের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত এই দেশে এটা কেবল এক দুই জেনারেশনের ব্যাপার নয়।

এখান থেকে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। একটানা ঘুরে ঘুরে মনটা চাইছিল সাময়িক বাসস্থানে ফিরতে। মানে লণ্ডনে। তা ছাড়া মেয়েরও পড়ার জন্য ফেরা দরকার।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হাঁটছি। বোধ হয় টেলিপ্যাথি কাজ করল। আমার মন নাড়া দিল মেয়ের মনকে। তাই বোধ হয় এই মুহূর্তে ও বলে উঠল, "চল, এবার ফেরা যাক। দুদিনের মধ্যে ত কলেজ খুলে যাচ্ছে। গিয়ে বইখাতা ঠিক করে বসতে একটা দিন লাগবে।"

"আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। এখন যেন কদিন স্থির হয়ে যা দেখলাম জানলাম শিখলাম তা ভাবনার মধ্যে নিতে ইচ্ছা করছে। চল কালই বেরিয়ে পড়া যাক লণ্ডনের দিকে।"

"কয়েকটা জায়গা কিন্তু রইল বাকি—শ্বাফাউসেন, লেক কনস্টানস, ররস্কার ইত্যাদি। তার কি হবে?" সে বলে উঠল।

"বারে! আমার পড়া?"

"অনুর পড়া ত আছেই। তাছাড়া তুমি কি ভাবছ এটা হবে আমাদের অগস্ত্য যাত্রা? আবার আমরা এখানে আসব বাকিটা দেখবার জন্য।"

"তুমি এত সিওর ভাবে বলছ কি করে?"

"জানত আমার প্ল্যান হয়ে যায় অনেক অনেক আগে থেকে। অনেক দিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম, "থ্রি কয়েন্স্ ইন দি ফাউনটেন, মনে পড়ে?"

"পড়ে না আবার? খুব সুন্দর ছিল যে।"

"ঠিক বলেছ, সেই থেকে শিখে রেখেছি রোমে গিয়ে সেই ঝরণাতে দেব ফেলে তিনটি কয়েন। বাস্ আবার আসাটা পাকা হয়ে যাবে।"

"মনে পড়ে সেখানে যারা যা চাইবে তাই পাবে। শুধু চাইবার সময় তিনটি মুদ্রা ফেলে দিতে হবে জলে। তাই আমি ওখানে গিয়ে ইউরোপে আবার আসার ইচ্ছে জানিয়ে দেব কয়েন্ ছুড়ে।"

"যাক্ তবে ত কোন ভাবনাই নেই। নিশ্চিন্ত মনে লণ্ডনে ফেরা যাবে কাল। দেশটার প্রায় সবটাই দেখা হোল। যা অল্পস্বল্প বাকি রইল তা পরের বারের জন্য তোলা থাকল।"

"নিশ্চয়ই। পিছনে কিছু ফেলে না গেলে কেউ কি আবার ফিরে যায়?"

১২

লাক্সেমবার্গ এক মজার দেশ।

মানে, এত ছোট্ট দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

যারা ম্যাপ বানায় বা আঁকে তারা বলে এর ম্যাপের ওপর নাম লেখার জন্য জাদুকরের দরকার। লাক্স লিখতেই সব জায়গাটা ফুরিয়ে যায়।

আমার মনে হয়, দেশটা অতি ছোট বলেই বোধ হয় সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যই এইসা লম্বা এক নাম রেখেছে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত।

এক হাজার স্কোয়ার মাইলের দেশ, এক লক্ষ লোককে নিয়ে। তা বলে একে তুচ্ছ মনে করবেন না। নাক সিঁটকাবেন না। এর যেমন আছে ঐতিহ্য, তেমনই বীরত্ব ও ঐশ্বর্য।

এই মিনি দেশটাকে প্রকৃতি যেন তিন ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব হচ্ছে সুন্দর হাইল্যাণ্ড। সে দিকে চারশ থেকে হাজার বৎসরের পুরোনো সব দুর্গ আছে। দক্ষিণ হচ্ছে শস্য শ্যামলা ক্ষেত-খামারের দেশ। আর পূর্ব দিকে যে দিকেই তাকাবে নয়ন ভোলানো আঙুরের ক্ষেত।

অনেক অনেক আগে এই দেশটা লাক্সেমবার্গ হিসাবে ছিল না। কিছুটা এই রাজ্যের সঙ্গে জড়িত, কিছুটা সেই রাজ্যের সঙ্গে জড়িত। আলাদা এই দেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না। নয় শ তেষট্টি সালে কাউন্ট অব আরডেনেসের ছোট ছেলে আলজেট নদীর ধারে কিছু জমি ও পাহাড়ের উপরের একটা ভাঙা রোমানদুর্গ পান। এই কাউন্ট খুব বীর ও সাহসী ছিলেন। উনি যুদ্ধ করে এর চারধারে অনেক জায়গা দখল করেন। এই দেশের নাম তখন থেকেই হয় "লুটজেলবার্গ"। এই নামটাকেই ইংরেজীতে বলে লাক্সেমবার্গ!

তখনকার দিনের ও দেশের লোকেদের এখনকার আমাদের দেশের কিছু লোকের সঙ্গে বেশ মিল আছে। আমাদের দেশের বেশ কিছু লোকের যেমন দেশাত্মবোধটা একেবারে নেই। সে রকম নেতার সব সময় দরকার এদের সচেতন রাখবার জন্য। ঠিক সেই রকমই ওই দেশের ব্যারন যখন যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন দেশের লোকেরা যথেচ্ছাচার করে একেবারে ধারে দেনায় ডুবে যায়।

দেশটা বিশ্বের চোখের অন্তরালে চলে যায়। এই দেশটার অস্তিত্ব সকলের মন থেকে মুছে যায়। এই দুরবস্থার মধ্যেই এদের অনেক বৎসর কাটে।

এটুকু ত দেশ। জন্মেও ছিল ত অল্প দিন আগে। তার অস্তিত্ব মানুষের মন থেকে মুছে যাওয়া এমন আর কি আশ্চর্যের কথা ?

আমাদের ভারতবর্ষ হাজার হাজার বৎসরের স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য নিয়েও ত হাজার বৎসরেরও বেশী অন্ধকারের অন্তরালে মুখ ঢেকে ছিল। মনুষ্যত্বের অভাব।

মহান নেতা দেশকে উদ্ধার করতে পারে। দেশের লোকেদের সাময়িক সচেতন করতে পারে। কিন্তু লোকেরা নিজেরা যদি মানুষ না হয় তবে সেটা কত দিন রক্ষা হতে পারে? ভগবান নিজে এসেও ত চিরকালের জন্য মানুষকে পরিবর্তিত করতে পারেন নি। তাই ত গীতায় বলেছেন

"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে একটা কথা আমাদের মনে আসে: যখনই যে দেশ মেয়েদের দ্বারা চালিত হয়েছে সেই দেশ অনেক অনেক বেশী এগিয়ে গেছে।

বৃটেনের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলেই দেখা যায় এই দেশ প্রথম বিশ্বের চোখে বড় হয়ে দেখা দিল রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়। তারপর বৃটেনের আকাশ সূর্যের আলোতে উদ্‌ভাসিত হোয়ে উঠল রানী ভিক্টোরিয়ার সময়।

রাশিয়ারও তাই। রানী ক্যাথরিন দ্য গ্রেটই প্রথম তাঁর দেশকে দু'পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। অস্ট্রিয়ার রানী মারিয়া থেরেসা তাঁর দেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তখন লাক্সেমবার্গের অবস্থা শোচনীয়। কাউণ্টেস্‌ আরমেসিনডে এগার শ ছিয়ানব্বইতে আবার এই দেশকে তুলে ধরবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। উনি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে ছিলেন কয়েক শ

বৎসরের পরের, যদিও জন্মেছিলেন তখন। তাঁর একান্ন বৎসর রাজত্বকালে দেশ আয়তনে তিনগুণ বড় হয়েছিল।

তিনি রাজ্য চালনার ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেছিলেন। শিক্ষার মান উঁচুতে তুলেছিলেন। তাছাড়া চারটার্স্ অব ফ্রীডম স্বাধীনতার সনদে লোকেদের আংশিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অসামান্য কাউনটেস্ এই দেশের পক্ষে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিলেন।

তারপর অনেক বৎসর কেটে গেল হাসি কান্না, ঝড় ঝাপটার মধ্যে দিয়ে। কত ডিউক এলো, গেলো। এই দেশ পরাধীন হয়ে থাকে চারশ বৎসর কিন্তু এখানকার লোকেরা একদিনের জন্যও ভোলে নি যে ওরা স্বাধীন ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশ আবার স্বাধীনতার আলো দেখতে পায়। এই গ্র্যাণ্ড ডাচি লিগ্ অব নেশ্যানের মেম্বার হয়।

এই সময়ে এখানকার লোকেরা জোর কদমে এগিয়ে যায়। মেয়েরা পায় ভোটের অধিকার। স্টীল মিলিয়নেয়ার এমিল মেরিশ ইন্টারন্যাশনাল স্টীল কারটেলএর চেয়ারম্যান হন। এই সময়ে তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে থাকে শিল্পে, বাণিজ্যে, মনুষ্যত্বে ও বিদ্যায়। বিশ্বের দৃষ্টি সম্ভ্রমে এদিকে চোখ ফেরায়।

এখানকার লোকেরাও এই নূতনত্বের স্বাদ অন্তরে অনুভব করে ও হৃদয়ঙ্গম করে।

কিন্তু তারপরই তাদের উপর নেমে আসে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নাৎসি আর্মি নিমেষে এই ছোট দেশটা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও রাজপরিবার ও তখনকার কয়েকজন নেতাদের বের করে দিতে পেরেছিল।

তারা বুঝেছিল যে সাধারণ লোকেরা মরলে দেশের তেমন ক্ষতি নয়। দেশ আবার দাঁড়াতে পারবে যদি মাথারা নেতারা বেঁচে থাকেন।

তাঁদের সেই বুদ্ধি ছিল বলেই আবার দেশ দাঁড়িয়েছে। আবার দশ দেশের এক দেশ হয়েছে।

মনে পড়ে, আমাদের দেশের সংগ্রামের সময় নেতাদের গায়ে যেন এতটুকু আঁচড় না লাগে সেইজন্য শয়ে শয়ে সাধারণ লোক প্রাণ দিয়েছে। শুধু প্রাণ কেন শত সহস্র দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। কত প্রলোভনকে জয় করেছে। তারা বুঝেছিল, যারা বড় তারা বেঁচে থাকলে কোন দিন না কোন দিন দেশ আবার উঠে দাঁড়াবে। আবার স্বাধীন হবে।

আজ যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, অসংখ্য বৎসরের লাঞ্ছনার পরে আমরা এগুতে আরম্ভ করেছি। তখন সেই সব লোকেরা কোথায়? যারা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে, শুধু নিজেদের ইষ্ট চিন্তা না করে দেশের নেতাদের তুলে ধরেছিল? তারা এই কথা বুঝেছিল বড়দের নেতাদের ওপর রাখলেই দেশ এগুবে। এখন দেখি বড়দের ছোট করবার স্পৃহা তাদের টেনে নিজেদের মতন করাটাই একমাত্র চেষ্টা।

ওখানে রাতে হোটেলে পৌঁছেই মেয়ে বলল এ যা বাচ্চা দেশ, কালকে সকাল সকাল কোচ এ বের হয়ে পড়লেই প্রায় সবটাই শেষ করে ফেলা যাবে। যেটুকু বাকী থাকবে পরশু বিকালে প্লেনে বেলজিয়াম রওনা হবার আগেই খতম করে নেওয়া যাবে। আমরা একটু হাত মুখ ধুতে ধুতে ও চরকিপাক খেয়ে ছোট হোটেলের বাকি বাসিন্দাদের খোঁজ নিয়ে হাজির।

ঢুকেই বলল, জব্বর খবর আছে, মা। তুমি ঠিক ঠিক যা চাও ঠিক তাই পাওয়া গেছে।

বললাম, "কি এমন অমূল্য রতনের সন্ধান পেলি?"

"অমূল্য রতন আমার কাছে নয়, তোমার কাছে। এক ইতিহাসের ছাত্র আমেরিকা থেকে এসেছে এই দেশের ইতিহাসের উপর রিসার্চ করতে। আমি কিন্তু বলে এসেছি আমার মা দেশের ইতিহাস জানতে খুব উৎসাহী, তাই আমরা সবাই এক টেবিলে বসে খাব আর তুমি সব বলবে। আর একটা কথাও কিন্তু আমি বলেছি যে আমার পুরোনো জিনিসে বিশেষ উৎসাহ নেই—!"

আমি ত একবারে নেচে উঠলাম। বললাম, "সত্যিই তুই আমার মেয়ের উপযুক্ত কাজ করেছিস্।"

"এতেই এত। আরও একটা ব্যাপার করেছি। শুনলে ত তুমি হার্ট ফেল করবে। একটু টনিক বা ওয়াইন্ খেয়ে নেবে নাকি? রিস্ক্ নিতে ত পারি না।"

"কি যে সব সময় পাগলামি করিস। বলে ফেল না বাবা।"

"যখন খাবে না তখন এখানকার নাম করা হোয়াইট মোজেল ওয়াইন টেস্ট করবার অনুমতি দাও। খেতে নাকি একদম শ্যাম্পেনের মত।"

"ঠিক আছে, তাই দিলাম।" যে দেশের যে নিয়ম তা মেনে চলাই ভাল।

"হোটেলের মালিকের মেয়ে এখানে কলেজে পড়ে। ওকে পটিয়ে নিয়েছি। কালকে আমাদের গেস্ট হয়ে আমাদের সঙ্গে সারা মুলুকটা ঘুরবে। তুমি ওদের দেশের সব কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে।"

বললাম, "এ রকম একজন থাকলে আর ভাবনাটা কি।"

সেই ছেলেটির কাছ থেকে এই দেশের খবর যা জেনেছিলাম তাই আপনাদের কাছে এতক্ষণ পেশ করলাম।

পরদিন ভোরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা ত্রিমূর্তি সবে চেনা মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অজানাকে জানতে।

আমার মেয়ে ও এই অজানা মেয়ে দুজনেরই এক জায়গাতে মিল থাকাতে নিমেষে মিতালী হয়ে গেল। দুজনেই ইউনিভার্সিটি স্টুডেণ্ট। যদিও দুজনে আসছে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে। মেয়েটা ফ্রেঞ্চ অরিজিনের। নামটা মারী; দেখতেও মিষ্টি। বেশ ইংরাজী বলে। এ দেশের লোকেরা বেশীর ভাগই আমেরিকাতে হোটেল করেছে। মানে এখন এখানে যত লোক আছে প্রায় তত সংখ্যক লোকই। তাই ইংরেজী ওদের কাছে মাতৃভাষা না হলেও প্রায় তাই।

প্রথমই আমরা গেলাম "ব্রোকেন টুথ" নামে একটা ভগ্ন দুর্গ দেখতে। কিংবদন্তী আছে সিগফ্রাই আলজেট উপত্যকা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। পর্বতের উপর একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দেখে মুগ্ধ হন ও তাকে বিয়ে করেন।



স্ত্রী মৎস্যকন্যা হয়ে চান করছে

এই সুন্দরী মেয়েটি তাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নেয় যে, সিগফ্রাই

কখনও তার বিষয়ে জানতে চাইবে না ও প্রতি শনিবার সে একা থাকবে। মেয়েটির নাম ছিল মেন্নুসিন।

বিয়ের উপহার হিসাবে মেন্নুসিন জাদুমন্ত্রে একরাতের মধ্যে এই দুর্গটা বানিয়ে স্বামীকে উপহার দেয়। বহু বৎসর এই দুর্গে এরা সুখে বাস করে। সিগফ্রুই-এর মনে ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ দেখা দিতে থাকে। তাই এক শনিবার সে চুপে চুপে স্ত্রীর পিছে পিছে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী মৎস্য কন্যা হয়ে চান করছে! সিগফ্রুইকে দেখে মৎস্য কন্যা অদৃশ্য হয়ে যায়। তার এই দুর্গ ও তার অধিবাসীরা ধ্বংসের দিকে যায়।

এ রকম কথাও আছে যে সাত বৎসর বাদে বাদে মেন্নুসিন রূপসী তরুণী সেজে বা সাপের মূর্তিতে একটা চাবি মুখে নিয়ে আসে। যদি কোন সাহসী ছেলে তাকে চুমো দেয় তবে মেন্নুসিন শাপমুক্ত হবে ও লাক্সেমবার্গের সব ধনসম্পত্তি পাবে।

যদিও পরীর গল্প তবুও কেন জানি না তার একটা আলাদা অদ্ভুত মন মাতানো আকর্ষণ আছে। তাই ঠাকুমা ঠাকুর্দার ঝুলি কোনদিন পুরোনো হয় না, হবেও না।

এখন পর্যন্ত এ দেশের জাতীয় বীর হিসাবে সকলে জন দি ব্লাইণ্ড, লাক্সেমবার্গের কাউণ্টকে মনে রেখেছে। উনি একেবারে চোখে দেখতে পেতেন না। তবুও তের শ ছেচল্লিশে ক্রেসীর যুদ্ধক্ষেত্রে সব যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তার সৈনিকদের তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁর স্বনামধন্য তরোয়াল ঘুরিয়ে মৃত্যুর আগে অনেক শত্রু ধ্বংস করেছিলেন। ওঁর মটো আদর্শবাণী ছিল "আই সার্ভ", আমি সেবা করি—।

এখানকার আওয়ার লেডি অব লাক্সেমবার্গের মন্দির দেখবার মত। ইস্টারের পরের তৃতীয় রবিবার থেকে পঞ্চম রবিবার পর্যন্ত হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এখানে হেঁটে আসে এবং প্রার্থনা করে এই মূর্তির রক্ষার জন্য।

এই উৎসবের শেষ দিকে হাজার হাজার লোক শোভাযাত্রা করে

ম্যাডোনাকে ক্যাথিড্রাল থেকে মাথায় করে নিয়ে যায় এবং শহরের বিভিন্ন জায়গাতে বানানো ফুলের সিংহাসনের উপর রাখা হয়।

ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে এই দেশের বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। ক্যাথিড্রালের একটা অতি সুন্দর মডেলও এখানে আছে।

মিনি জায়গাটার অর্থনীতির দিকটা বেশ অনেকটাই নির্ভর করে ইউরোপীয়ান স্টীম ও কোল কমিউনিটির উপর। আমেরিকানদের এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। কারণ গত মহাযুদ্ধে তাদের সাহায্যেই বলতে গেলে এদের স্বাধীনতা বজায় থাকে।

এখানে আমেরিকান সৈনিকদের কবরস্থান 'হ্যাম' লোকদের কাছে একটা শ্রদ্ধার জায়গা। ওখানে এই দেশের অধিবাসীরা অনেকেই প্রতি রবিবার ফুল দিতে যায়। মনে হয় যেন এই দেশেরই বীর তারা। এত এদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। এটা দেখলে মনে হয় এরা সত্যিকারের দেশভক্ত। নিজের দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তা সে নিজের দেশেরই হোক বা বিদেশীই হোক তাদের তারা চিরকালের জন্য মনে রেখেছে ও চিরকাল ভালবাসবে।

এই চেতনা না থাকলে কোন দেশই বড় হয় না বা বড় থাকতে পারে না। তাই মনে হয় আমার দেশ সেটা একদিন মর্মে মর্মে বুঝবে ও বড়র চেয়ে বড় হবে। সেদিন জগৎজননী জগৎমোহিনী ভারতবর্ষর দিকে পৃথিবী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দেখবে। সেই ক্ষণটার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

এই দেশের উত্তর দিকটার নাম ল্যাক্সেমবার্গ-আরডেন্স্। এই দিকটার সঙ্গে বেলজিয়াম দেশের বেশ মিল আছে।

আমরা প্রথম গেলাম চতুর্থ দশকের রোমান ভিলা দেখতে। এতে আমরা পাই মোজাইকের কাজ। এই সময় রোমানরা এখানে রাজত্ব করত! তের শ পঞ্চাশে ডায়ানডেল রাজ্যের এডেলেড নাসাউ রাজের বোনকে বিয়ে করে। এই কারণে এখানকার দুর্গ নেদার-

ল্যাণ্ডের রানী জুসিয়ানা ও এই দেশের ডাচেস সারলোটের পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান ছিল। এরই কাছে একটা সুন্দর মিউজিয়াম আছে। পুরোনো কালের সব অস্ত্রশস্ত্র রাখা আছে।

এখানে ভিক্টর হিউগো এসে কিছুদিন ছিলেন। যে বাড়িতে ছিলেন সেটা এখন ভিক্টর হিউগো মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে।

এই জায়গার লোকেরা যে কত সাহসী, সত্যবাদী ও দেশভক্ত ছিল তা একটা ঘটনা থেকে খুব ভাল মতনই উপলব্ধি করা যায়। সতের শ আটানব্বই সালে ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য এখানকার অল্প বয়সী চাষীরা কুড়াল, কোদালী, কাস্তে, লাঠিসোটা ইত্যাদি সামান্য জিনিস নিয়েই যুদ্ধ করতে যায়। এই দলের নেতাদের ফ্রেঞ্চ মিলিটারীরা ধরে ফেলে এবং ওদের এই অবস্থা দেখে ট্রাইবুন্যালের ওদের উপর দয়া হয় ওরা তাদের বলে, "তোমরা যদি বল যে বন্দুকে গুলি ছিল না, আর সত্যি করে তোমরা যুদ্ধ করতে আসনি তবেই তোমাদের আমরা ছেড়ে দেব "

তারা কিন্তু বলেছিল, "আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলি না। তারা জীবন বাঁচাবার জন্যও মিথ্যা কথা বলেনি তাই প্রত্যেককেই মরণকে বরণ করতে হয়েছিল "

ঐ জায়গাতে দাঁড়িয়ে শুধু একটা কথাই মনে এসেছিল, "তোমাদের করি নমস্কার "

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট-এর প্রপিতামহ ফিলিপ ড্য-লানয় ষোল শ একুশ সালে এখান থেকে আমেরিকায় চলে যান।

এখানকার রেডিও ট্রান্সমিটার স্টেশন ইউরোপের একটা সব-চাইতে শক্তিশালী স্টেশন।

একটারনাক নামে জায়গাটা হচ্ছে এখানকার সুইট্জারল্যাণ্ড। সৌন্দর্যময়ী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে রূপের রানী সুইট্জারল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা হয় না। আর তুলনা হয় না মর্ত্যের স্বর্গ কাশ্মীরের সঙ্গে।

এখন আমরা চলেছি ফিরতি পথে। এখানে এসে প্রথম ভেবেছিলাম এইটুকু ত দেশ, কি আর দেখব কি আর জানব। এখন মনে হচ্ছে শিখবার মত কিছু থাকবার জন্য কোন দেশের পরিধিতে বড় হওয়ার দরকার হয় না। দেশ অনেকটাই বিচার্য হয় মানুষ দিয়ে। তাই সংখ্যার দরকার হয় না।

অণু থেকেই হয় পরমাণু। সেইরকম সীমার মধ্যেই অসীমের ডাক শোনা যায়।

মারী কত কথাই বলল। একটা কথা মনে বড় লেগেছে। বলল. জান, তোমার দেশের লোক ও আমার দেশের লোকের মধ্যে একটা মস্ত বড় মিল আছে তোমাদের দেশ এত বড় হলে হবে কি। আমাদের এই ছোট দেশের মত বারে বারে পরাধীনতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু দুই দেশের লোকেরা একটা কথা কোনদিন ভোলেনি "আমরা যা আছি তাই থাকতে চাই।" তাই তোমাদের মত আমাদের আছে নিজত্ব। তাই আমরা বারে বারে পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়িয়েছি ও দাঁড়াব।

আমাদের চারিদিকে অনেক বড় বড় দেশ আছে। আমরা কিন্তু আমরাই রয়ে গেছি।

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ছোট দেশটা সম্বন্ধে বড় ঠিকভাবে নিয়েছেন ফ্রান্স, জার্মানী আর সুইট্জারল্যাণ্ডের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই ছোট দেশ ফরাসীও নয়, জার্মানও নয়, বেলজিয়ামও নয়। আবার এই তিনের মেশানও নয়। কিন্তু এর একটা সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্টতা আছে নিজস্ব শারীরিক সামাজিক আর জাতিগত চরিত্র নিয়ে।

এখানকার লোকেরা সাদাসিধে হলেও তারা বিশ্বের ব্যাপারে উৎসাহী ও পৃথিবীর সবাইকে জানতে বুঝতে ও ভালবাসতে চায়। এদের লিখিত ভাষা নেই। তাই এরা ফরাসী ভাষাকেই মাতৃভাষা ভাবে নিয়েছে। যদিও কথা বলার সময় নিজের ভাষায় বলে।

ভাষা শেখার একটা অদ্ভুত শক্তি এদের মধ্যে দেখা যায়। অনেকেই অনেক ভাষা জানে।

এখানকার লোকেদের অবস্থা ভালই। তার কারণ এদের লোহা ইস্পাত আর কয়লা আছে অপর্যাপ্ত। উইলটজ শহরে চামড়ার ইণ্ডাস্ট্রী ইউরোপের বড়গুলির মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়াও আছে—ওয়াইন, স্লেট, সেরামিক, কাপড়, তাছাড়া মটরবাইকের কারখানা ইত্যাদি।

সব চাইতে যে ব্যাপারটা আমাকে আশ্চর্য করেছে সেটাই আমি এখন আপনাদের বলছি।

এরা এদের রাজাকে নির্বাচন করেছিল আঠার শ নব্বই খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য এক বনেদি ঘরের ছেলেকে। অদ্ভুত লাগে আমার ভাবতে যে সত্যিই ভারতবর্ষ কত বিরাট, কত মহান ছিল। আদর্শে, নূতনত্বে, মহত্বে, পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী ছিল।

যা এই ইউরোপীয়ান দেশ সেদিন করে গর্ব বোধ করেছে তা আমার ছোট বাংলাদেশ হাজার দেড়েক বৎসর আগে করেছে এবং আরও সুষ্ঠুভাবে। বাংলাদেশের লোকেরা গোপাল বলে একজনকে নির্বাচন করে রাজা করেছিল। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। সেই থেকেই পালবংশের সৃষ্টি। কি ছিল আমাদের দেশ সব বিষয়ে, ভাবতে সারা শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

যখন লাক্সেমবার্গ হল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হোল আঠার শ নব্বই খ্রীষ্টাব্দে নাসাউর ডিউক অ্যাডলফকে নির্বাচন করে। তার ছেলে চতুর্থ উইলিয়াম যদিও রাজা হন কিন্তু তাঁর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য স্ত্রী মারী অ্যানকে রাজত্ব চালাবার ক্ষমতা দেন। তাদের মেয়ে মেরী এডেলেইড মার পর রাজত্ব চালান। উনিশ শ উনিশ খ্রীষ্টাব্দে উনি নিজের ইচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন।

তারপর কথা ওঠে এই দেশে প্রজাতন্ত্র মতে প্রেসিডেণ্ট হবে না, ডাচেসের ছোট বোন বসবে সিংহাসনে। লোকেরা সকলেই ডাচেসের ছোট বোন শারলোটের জন্য ভোট দেয়। সেই থেকে গ্র্যাণ্ড ডাচেস শারলোটই দেশকে চালাচ্ছেন।

হোটেলে সকালে খাবার টেবিলে একটি মজার কথা শুনলাম।

শুনেই মনে পড়ে গেল নিজের দেশের একটা চালু কথা—যেখানে বাঙালী, সেখানেই কালীবাড়ি সেখানেই দলাদলি।

এখানে ঠিক সেইরকম—

একজন লাক্সেমবার্গার, একটি গোলাপবাগ।

দুজন লাক্সেমবার্গার, একটি কফির আড্ডা।

তিনজন লাক্সেমবার্গার, একটি ঐকতানবাদন।

ভোরবেলা চলে যাব, শুয়ে শুয়ে এই দেখা ও তার লোকেদের কথাই ভাবছিলাম।

ছোট দেশ, কিন্তু মন এদের খুব বড়। সবাইকেই আপন ভাবতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে।

যেখানেই গেছি, যার সঙ্গে কথা বলেছি সবাই হাসি ছাড়া কথা বলেনি। কোন হিংসা নেই, দ্বেষ নেই।

এর একমাত্র কারণ হোল এরা যা তাই থাকতে চায়। তাই অন্যকে হিংসা করার ভাবনা তাদের আসে না। যেন সবাই চাইছে :

"সবারে করি আহ্বান।"

১৩

মেয়ের ছুটি।

আমাদেরও তাই।

বেরিয়ে পড়লাম লণ্ডন থেকে। অনেকদিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। মনস্থির করে এসে গেলাম সবাই মিলে হল্যাণ্ডের বিখ্যাত শহর আমস্টারডামে।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের বদ্ধমূল ধারণা দেশের রাজধানী হবে দেশের সেরা শহর।

যেমন আমাদের দিল্লী হচ্ছে সাজানো শহর। সব জায়গা থেকে

সব কিছু এনে এখানে হাজির করা হয়েছে। সব কিছু মানে ধন-দৌলত। আমাদের 'প্রেসটিজ' মর্যাদার শহর।

বিদেশীরা এখানে এসে বাহবা দেয়। দেবে নাই বা কেন? পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সাজানো, গোছানো ওয়েল প্ল্যানড। এদেশেরই অন্য কোন জায়গার সঙ্গে তুলনাই হয় না।

দেশ যত গরীব হবে এই তফাতটা ততই প্রকট হবে। যেমন সাধারণ বাড়িতে বসবার ঘরটা কোনরকমে একটু ঠিক করে রাখা হয়। বাকিগুলোকে কিছু করার সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। ধনী দেশে তা নয়। রাজধানী সুন্দর বটেই তবে বাকিগুলোও সাজানো। মানে সারা দেশটাই সযত্নে রাখা।

অনেক বৎসর আগের একটা কথা মনে হোল। আমরা তখন দিল্লীতে। পণ্ডিতজী প্রধানমন্ত্রী। ইউনেসকোর কনফারেন্স চলছে তার ভাবী ডিরেকটার জেনারেল মিস্টার মেহুর সঙ্গে একদিন আমাদের বসবার ঘরে বসে গল্প হচ্ছে নানা কথার মধ্যে ভারতবর্ষের কথা উঠল।

উনি আমাদের দেশে প্রথম এসেছিলেন ভারত যখন পরাধীন ছিল। তাই উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের কত উন্নতি হয়েছে কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোমরা রেখেছ। দিল্লীতে রাস্তায় বের হলে ময়লা বা ছেঁড়া কাপড় পরা লোক চোখে পড়ে না।

আমি প্রথম জিজ্ঞাসা করে নিলাম, "তুমি কি ভারতবর্ষের অন্য অন্য জায়গাতে যাবে. না এখান থেকেই সোজা প্যারিসে ফিরে যাবে?"

এখান থেকে আমি সোজাই ফিরে যাব, আমার একেবারে সময় নেই।

এই কথাটা শুনে বুঝলাম ওঁকে ধোঁকা দেওয়া যাবে। কেন দেব না? নিজের দেশকে বড় করতে কার না সাধ যায়? তাছাড়া এটা ত খুবই ঠিক এত কম সময়ের মধ্যে যা এগিয়েছে তা কি সহজ কথা?

এখনও মনে আছে সগর্বে বলেছিলাম, ঠিকই বলেছ—স্বাধীন হবার পর অতি দ্রুত আমরা এগিয়ে চলেছি। খুব কঠিন, তাও চলেছি এত যুগের পিছিয়ে পড়াটাতে মেক্‌আপ্‌ করতে হবে। আর কে আমাদের কাণ্ডারী দেখ। পারব নাই বা কেন আমরা ?

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের এক বন্ধুর দেওয়া ঠিকানা অনুসারে কাছেরই এক হোটেলে গিয়ে উঠলাম বেশ হোটেল। বড রাস্তার উপর শহরের সিটি সেণ্টারের কাছে।

শহরের মাঝখানে থাকলে খুব সুবিধা। অনেকটাই হেঁটে মেরে দেওয়া যায়। বেড এবং ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে।

মাল নামিয়ে কাপড় পাল্টে বেরিয়ে গেলাম। শহরটা ভালভাবে দেখতে হবে যতটা সম্ভব, আর পরের দিনের জন্য দূরপাল্লার কোচের টিকিট কিনতে হবে।

প্রথমে গেলাম রয়েল প্যালেস দেখতে। এর সাতদিকে সাতটি তোরণ অর্থাৎ আরচ্‌ওয়ে আছে। তখনকার দিনে এর সাতটা স্টেট ছিল বলে। চারিদিকে নেপচুন ও মিথলজিক্যাল পৌরাণিক সামুদ্রিক জন্তুর প্রস্তর মূর্তি আছে।

এখানে দু' বৎসর নেপোলিয়নের ভাই লুই বোনাপার্ট ছিলেন ও রাজত্ব করেছিলেন। যদিও এটা রাণী জুলিয়ানার বাসস্থান উনি কিন্তু থাকেন সোয়েসটিকে। বাইরে থেকে যখন বড় কেউ আসে তাদের এখানে রাখা হয়।

একটু এগিয়ে গেলেই হচ্ছে নিউ চার্চ। এখানকার সব চাইতে বড় কবি ভনডেলের কবর রাখা আছে। এই কবির নামেই এখানকার বড় পার্ক—ভনডেল পার্ক।

আমস্টারডামের রাস্তায় বেরিয়ে একটা জিনিস খুব নজরে পড়ে। নিখুঁত রাস্তার উপর সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের বাড়ি। পথ দিয়ে যেতে বাড়ির ভেতরের সাজানো সবকিছু দেখা যায় বলে রাস্তাকে শুধু চলার জন্যই আছে বলে মনে হয় না। মনে হয় বাড়ি রাস্তা লোক সব মিলে যেন একাকার হয়ে গেছে। কেমন একটা একাত্মবোধ আছে।

চারিদিকে তাকিয়ে যখন এই ভাবের মধ্যে ছিলাম হঠাৎ কানে এলো একটি পথিক যেতে যেতে বলে গেল : কেমন সুন্দর দিন, তাই না ? আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন।

ওর দিকে তাকিয়ে আনন্দে মনটা ভরে গেল। নেই কোন পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার, নেই কোন আত্মম্ভরিতা। আছে শুধু স্বতঃস্ফূর্ত সহজ ভাব যা মানুষের মনকে দেয় তৃপ্তির প্রলেপ।

লণ্ডন থেকে এসেছি বলেই বোধহয় আরও বেশী মনে হোল। ইংরেজ বড় কাটখোট্টা জাত। চেনা করিয়ে না দিলে কথা বলবে না। এটা মানতে হবে, ওটা মানতে হবে।

তাই ওখানে দেখেছি ভারতবাসীরা ইংলণ্ডে যায় এবং টাকার লোভে থাকেও বটে। কিন্তু যার যার গণ্ডী একেবারে এয়ারটাইট। কালার দল আলাদা। মানে কালাতে কালাতেই ভাবসাব।

হল্যাণ্ডের বাড়ি যেমন খোলামেলা, লণ্ডনে ঠিক উল্টো। ইংরেজদের মতই বাড়ির ভেতরটা ঢাকাঢোকা। সব সময় পর্দা টানা। কেউ যেন কিছু দেখতে না পায়, না যেন কিছু জানতে পারে।

বাসস্থান যে মানুষকে দিয়েই তৈরী। তাই তার মনের ধারাটাই এতে ফুটে ওঠে।

এই দেশটাই হচ্ছে সমুদ্র থেকে চুরি করা মাটি দিয়ে। দেশের লোকেরা আস্তে আস্তে সমুদ্র থেকে জমি ধার করে করে একে বড় করে তুলছে। সমুদ্রের সঙ্গে এদের চিরকালের যুদ্ধ চলছে। সাগরের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে বলেই বোধহয় এরা হাল্কা মেজাজের হতে পারে নি। আর পারেনি অলস হতে।

আর একটা গুণ গড়ে উঠেছে, একতা। সবাই একজোটে চলে। সবাই উপলব্ধি করে কত বড় এক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওদের টিকে থাকতে হবে।

ওদের মধ্যে দুই ধর্মের লোক রয়েছে—প্রটেসট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক। খুবই ধর্মভীরু। কিন্তু ওদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য নেই। এমনিতে তারা রয়েছে নিজেদের আলাদা আলাদা জগতে।

রোমান ক্যাথলিকরা রোমান ক্যাথলিক চার্চে যাচ্ছে, ক্যাথলিক রেডিও স্টেশন শুনছে, ক্যাথলিক ক্যানডিডেটকে ভোট দিচ্ছে। ঠিক সেইরকম অন্যরাও করছে। কিন্তু কোন লড়াই নেই। কোন ঝগড়া নেই। আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে এইরকম ধর্মপ্রবণতা কমে যাচ্ছে।

পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্ট একটা বাড়িতে ছিলেন ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৮ পর্যন্ত। ভাবতেই শরীরটা যেন এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে ভরে গেল।

চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর বিখ্যাত ছবি "নাইট ওয়াচ"। এই বাড়িটা উনি কিনেছিলেন যখন ওর খুবই নাম হয়েছে। এই বাড়িতেই তাঁর ছেলে টিটাসের জন্ম হয় এবং এই বাড়িতেই তাঁর ছেলে জন্মাবার এক বৎসর পরে তাঁর স্ত্রী সাসকিয়া ১৬৪২-তে মারা যান। তারপরই চিত্রকরের আঁকার আকাঙ্ক্ষা যেন কমে আসে। আস্তে আস্তে উনি ধার দেনায় ডুবে যান। তাঁর বাড়ি, ছবি ইত্যাদি বিক্রি করে ফেলতে হয় ধার শোধ করবার জন্য। এখন এটা হয়েছে তার নামে মিউজিয়াম।

এইরকম স্বনামধন্য আর্টিস্ট কত দুঃখই পেয়ে গেছেন জীবনে। জীবন বড় কঠিন। কল্পনা দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা যায় না। তার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, সবই তার বিচারের মাপকাঠিতে সমান। যার যতটা প্রাপ্য ততটুকুই সে পাবে। না এক চুল বেশী, না এক কণা কম।

এইখানে আরেকজন পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রকর জন্মেছিলেন ভিন্‌সেন্ট ভ্যান গগ্‌। এখানকার মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামে ভ্যান গগের ১৯৮টা পেইনটিং ও ৩১৯টা ড্রইং আছে এগুলো একটার পর একটা এমনভাবে সাজানো যে ওর ধাপে ধাপে বিকাশের ধারা বোঝা যায়।

এখানকার ফরেস্ট পার্ক মাইলের পর মাইল চলে গেছে। এটা ১৯৩৪-এ আরম্ভ হয়েছিল জগৎজোড়া মন্দার সময় রিলিফ দেবার

জন্য। এখন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এটা প্যারিসের বোয়া দ্য বুলোঁর মত এবং নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের ডবল ২৪০০ একরের ওপর।

মোটরের, সাইকেলের এবং পায়ে চলার পথও আছে। এখানে এর অর্ধেকটা বন করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া থিয়েটারের জন্য খোলা জায়গাতে স্টেজ। নানারকম খেলার জন্য তৈরী মাঠ। তাছাড়া আছে ২৪০০ গজ লম্বা নৌকাবিহার।

হল্যাণ্ডের লোকদের ধারণা ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ওরা তৈরী করেছে হল্যাণ্ডকে।

কথাটার কিছু সত্যতা আছে বইকি। এটা একেবারেই সমতল ভূমি। পর্বত পাহাড় টিলা কোন কিছুই এতে নেই। যেদিকেই ফেরাই আঁখি শুধুই সমতার সৌন্দর্য। এখানে না আসা পর্যন্ত বুঝতে পারিনি সমতারও এতখানি চোখ ধাঁধানো রূপ আছে।

চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে সাঁইত্রিশ ফিট সমুদ্রের উপরে। এক ভাগ সমুদ্রের জলের লেভেলের নিচে যেটা ডাইক দিয়ে রক্ষা করতে হয়। এই জমিটা হবে ১,৫০০ বর্গমাইল। এখানকার লোকেরা সকলেই অবস্থাপন্ন। হঠাৎ বড়লোকের গরম আবহাওয়া এখানে নেই। সেইজন্যই বোধহয় এখানকার মুদ্রা খুব স্থিতিশীল।

টিউলিপ বলতে গেলে এদের জাতীয় ফুল। বেশীর ভাগ আমরা জানি না, এই ফুল মোটেই এখানকার নয়। এই ফুল প্রথম এই দেশে আসে এশিয়া মাইনর থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। এখানকার লোকেরা এই ফুলের চাষ করতে আরম্ভ করে। এত ভাল হতে আরম্ভ করে যে এটা একটা বড় ব্যবসায় পরিণত হয়। এরা পৃথিবীর সর্বত্র চালান দিতে থাকে। টিউলিপ বালবের উপর এরা ফাটকা খেলে।

আল্‌মিয়েসি ব্লুমেন ভেলিং ইউরোপে সবচাইতে নামী ফুলের অকৃশন হল। এখানে পাঁচটা বিরাট নিলাম ঘর আছে, কাটা ফুলের জন্য, বালবের জন্য ও পটশুদ্ধ ফুলের গাছের জন্য। সকাল সাতটা

থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে সব বিক্রি হয়ে যায়। আমাদের মত দেশের লোকের পক্ষে এক অভাবনীয় দৃশ্য।

আমরা ত ফুলের সেরকম ভক্ত নই। যদিও আমাদের কোন পুজোই ফুল ছাড়া হয় না। যেসব ফুল পুজোয় লাগে সেইসব ফুলের কদরও আমাদের দেশ থেকে উঠে গছে। কেমন যেন ছন্নছাড়া মন হয়ে গেছে। এত শত বৎসরের পরাধীনতা আমাদের চুষে ছিবড়ে করে ফেলেছে।

এখানকার নিলামের পদ্ধতি একেবারে অন্যরকম। সবচাইতে উচু দাম থেকে আরম্ভ হয়। বিরাট একটা ঘড়ির মিনিটের কাঁটা আছে। সেই কাঁটাটা সবচাইতে বেশী দামের থেকে ঘুরতে আরম্ভ করে। কেনার লোকরা যে দামে কিনতে চায় সেইখানে বোতাম টিপে দিলে কাঁটা থামে ও সেই দামেই সেইটা বিক্রীত হয়।

ফুলের রাজ্যে ঢুকে মনে হচ্ছিল সব ফুল কিনে তার মধ্যে ডুবে থাকি।

“ফুলের বনে যার পাশে যাই—
তারেই লাগে ভাল।”

কবির এই ভাব বড় সত্যি এই সৌন্দর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর রূপ বদলে গেল। মনে হোল, রূপে রসে গন্ধে ভরা এই ধরা সত্যিই তুলনাহীন। সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টির মধ্যে কোন মলিনতা থাকতে পারে না। যা কিছু হয়েছে বা আছে তা ক্ষণিকের।

রূপকথা কি শুধু কল্পনা? শুধু কি ঠাকুমার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসে? আমাদের এই চাঁছাছোলা টাকা আনা পাইয়ের পৃথিবীতেও বেশ রূপকথা তৈরী হচ্ছে।

হল্যাণ্ডের এই টিউলিপ ফুল নিয়ে কেমন অপরূপ একটা রূপ-কথার মত কাহিনী আছে।

সতের শতকে একটি দুর্লভ টিউলিপ ফুলের বালবের জন্য একজন টিউলিপ-প্রেমিক কি দাম দিয়েছিল জানেন? আট হাজার পাউণ্ড গম, ষোল হাজার পাউণ্ড রাই, চারটে বিরাট ষাঁড়, বাইশটি পশু,

হাজার গ্যালন বিয়ার, পাঁচশ গ্যালন মাখন, হাজার পাউণ্ড চীজ এবং আরো কত কি।

এত দাম ও এত প্রেম দিয়ে বোধহয় দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গের বাগান থেকে পারিজাত ফুল যোগাড় করা যেত।

অবশ্য সেটি হত রূপকথা। হল্যাণ্ডের কাহিনীটি কিন্তু সত্যি।

তবে ফুলের মূল্যের সত্য কাহিনীও আছে। এই ত সেদিন একটা নিলাম হল। ফুল বাগিচায় নয়. লণ্ডনের পৃথিবীবিখ্যাত নিলাম ঘরে।

একটি শুকনো বিবর্ণ হলদে গোলাপ বিকোল পনের হাজার টাকায়। বছর তিরিশ আগে সেটি বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সার সিসিল বীটনের বুকের 'বাটন হোল' আলো করেছিল। বীটন মাই ফেয়ার লেডী গীতিনাট্যের রূপকার আর ফ্যাশন জগতের মণি ছিলেন।

সব চেয়ে বড় কথা গ্রেটা গার্বো এই ফুলটিকে চুমু খেয়েছিলেন।

একাধারে রোমান্স আর রুপো আর রূপকথার মধু মিলন।

আরো বিস্ময় আছে। যিনি সুদূর নিউজিল্যাণ্ড থেকে এই শুকনো ফুলের অবশেষটুকু কিনেছেন তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। রূপকথার রাজপুত্র আর কাকে বলে?

তখনই নিজের জন্মভূমির কথা মনে হোল। ফুলের যদি ভালভাবে চাষ করা যায় তবে যারা ফুলের চাষ করবে তাদের ত মনও বড় হবে, আর যারা দেখবে উপভোগ করবে তাদেরও। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী মিডল্ ইস্টের লোকেরা অবস্থাপন্ন। তাদের কাছে বিক্রি করে অনেক ফরেন একচেঞ্জ আসতে পারে। অনেক রুজি রোজগারের পথ খুলে যাবে। কাশ্মীরের জাফরানের। বাগিচায় গিয়ে ঠিক এই কথাটাই মনে এসেছিল। একদিন না একদিন আমাদের দেশের লোক সব বিষয়ে এইভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে। সেদিন আর বেশী দেরি নেই। অন্ধকার কেটে আসছে। সেই বিশ্বাস আমি রাখি।

হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বড় ব্যবসা হচ্ছে ফুলের বালবের। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চালান দেওয়া।

অনেক ঘুরে অনেক জেনে, অনেক শিখে ত তিনজনে আস্তানায় এসে মরার মত ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনজনের একটা শোবার ঘর ও একটা বাথরুম। সাত সকালে ঘুম ভেঙে গেল অমুর হাসির চোটে। মনে মনে একটু রাগই হোল। এই সাত সকালে জানলা দিয়ে কি এমন দেখল যে এত জোরে জোরে হাসতে হবে? কোথায় একটু বেশী ঘুমিয়ে জিরিয়ে নেব। আবার ত সারাদিন ঘোরাঘুরি আছে।

অমুর খাটের দিকে চেয়ে দেখলাম ও অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। ভুল দেখলাম? না, ভুল শুনলাম? ভাল করে চোখ রগড়ে দেখলাম, না, মেয়েটা ত নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে। তার মানে ভুল শুনেছি এই ভাবতে না ভাবতেই অমুর প্রাণ খোলা হাসি শুনতে পেলাম। নিচের তলা থেকে ভেসে আসছে। আমি ত অবাক। এ আবার কি?

তখন দেবেশের আর অমুরও ঘুম ভেঙে গেছে। অমু ত রেগে লাল। কে আমার হাসি ও গলার স্বর কপি করছে?

বলতে চলতে ড্রেসিং গাউন পরে দৌড়ে নিচে নেবে গেল। একটু পরেই হাসতে হাসতে উপরে এসে হাজির।

কি, রে, কি ব্যাপার বলবি ত?

ও কিছু বলতেই পারছে না। হেসেই চলেছে। যেই থামছে আবার নিচের থেকে সেই হাসি। এই বাঁধ ভাঙা হাসির জোয়ারের মধ্যে পড়ে আমি ও দেবেশ কিছু না জেনে শুনেই হাসতে আরম্ভ করলাম।

একটু বাদে মেয়ে বলল, নিচে খাবার ঘরে যে চিড়িয়াখানার কাকাতুয়ার মত বিরাট কাকাতুয়া আছে সেইটাই এই রকম অদ্ভুত কপি করতে পারে। ওর যা ভাল লাগে তা ও হুবহু কপি করে। খাবার ঘরে বসে ত আমি হেসেছি। সেইটাই শুনে রেখেছিল। সকালে তাই একটু পরে পরে হাসছে।

নিচে পোর্টার বলল, ও মানে ত বোঝে না! এই ভাবে অনেক সময় লোকেদের আবোল তাবোল কথাও কপি করে বলতে থাকে। বুঝলে এখন থেকে আস্তে আস্তে কথা বলতে হবে। কে জানে কখন কোনটা মনে ধরে যাবে। হোটেলের মালিক ওকে ভীষণ ভালবাসে।



কে আমার হাসি ও স্বর কপি করছে?

এখানে থেকে একটা জিনিস খুব বুঝতে পারলাম। এরা খুব সততাপরায়ণ ও দিল খোলা। এত ভাল ব্রেকফাস্ট ও এতখানি করে খুব কম জায়গাতেই দেখেছি দিতে। এরা খাইয়ে আনন্দ পায়। সব সময় পাউণ্ড শিলিং পেন্স গোনে না।

এখানে এসে যদি আমরা একটা জিনিস না দেখে ফিরে যাই তবে সত্যিই ভুল করব। হীরে পাথর চিক্‌চিক্‌ করে কাটতে এদের মত পৃথিবীতে আর কেউ পারে না। শুধু কাটা কেন, পালিশ করার ওস্তাদিতেও ওরা বিখ্যাত। শুনলাম সব চাইতে বড় হীরকখণ্ড যা এই পর্যন্ত পৃথিবীতে পাওয়া গেছে তা এখানেই কাটা ও পালিশ করা হয়েছিল। এই পাথরটার ওজন ছিল দেড় পাউণ্ড। আবার এখানেই সবচাইতে ছোট ১/৪ মিলিগ্রামের পাথরও কাটা হয়েছে। এদের উজ্জ্বল পাথরের কাজ দেখতে দেখতে চোখ ঝলসে যায়। অদ্ভুত কারিগরী।

দেখতে দেখতে আবার হঠাৎ মনে হোল আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কি দরকার? চুনোপুটি মানুষ আবার হীরের কাজ দেখছে।

এবার আমরা চললাম হল্যাণ্ডের পোর্টের দিকে। পথে জানতাম নদীর পারে বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ইনডাস্ট্রী দেখলাম। আর দেখলাম এই নদীর ধারে ধারে পাঁচটা উইণ্ডমিল, নানা ধরনের। নানা ধরনের কাঠের বাড়ি একটার পর একটা সুন্দর ভাবে রয়েছে। মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

আমরা ইডাম নামে একটা ছোট মধ্যযুগের শহরে গেলাম। ওখানে কফি খাওয়া গেল। এ দেশেও দেখলাম এরা সব যুগকেই যত্নের সঙ্গে মনে রাখে। আবার এগিয়েও চলে দ্রুত গতিতে।

এই ছোট্ট শহরটাকে এমন করে মধ্যযুগের রূপ দিয়ে রেখেছে যে বাইরে থেকে যারা আসে তারা এক লহমায় বুঝতে পারে সেই যুগে হল্যাণ্ডে কি ছিল। এবং এখনকার অধিবাসীরাও শিখতে পারে ও জানতে পারে।

আমাদের দেশে অবশ্য এর বিশেষ কিছু দরকার নেই। আমরা ত বলতে গেলে প্রায় সেই যুগেই পড়ে আছি। এগুতে ত মাত্র আরম্ভ করেছি গত তিরিশ বৎসর যাবৎ। তা একটা জাতির জীবনে কতটুকু সময়?

আমস্টারডাম থেকে প্রত্যেক আধ ঘণ্টা অন্তর বাস যায় মনিকেনডামে। আমরা তিনজন তাই বাসে করে চলে গেলাম মনিকেনডামে। ওখান থেকে লঞ্চে করে যাওয়া হোল মারকেন বলে ছোট একটা মৎস্যজীবীদের গ্রামে। ওদের ঢিলাঢালা হাঁটু পর্যন্ত ব্রীচেস দেখে মনে হয় যেন ওরা গ্রীসের লোক, হল্যাণ্ডের নয়।

মেয়েদের ড্রেসের সঙ্গে ইস্ট ইনডিসের মেয়েদের সায়ার সঙ্গে বেশ মিল দেখা যায়। এই কাপড় পরার ঢংটা কেন হোল, কি করে এল কেউ বলতে পারে না।

এখানকার সকলেই প্রটেসটেন্ট।

বাড়িগুলোরও একটা বিশেষত্ব আছে। সরু সরু রাস্তার উপর ছোট ছোট সুশৃঙ্খল বাড়িগুলো দেখলে ঠিক স্টীমারের কেবিনের মত মনে হয়। ওরা যে আবহমান কাল থেকে সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই ছাপটা ওদের সব কিছুর মধ্যে রয়েছে। ওদের চার্চের ছাতে একটা পালতোলা নৌকো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ওখান থেকে ভলেনডাম খুব কাছে। কিন্তু ওদের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। ভলেনডামের সকলেই রোমান ক্যাথলিক। টুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে এখানে। এখানকার লোকেরা ব্যবসার খাতিরে ট্রাডিশন্যাল পোশাক পরে থাকে সব সময়। এইজন্য এদের বেশ রোজগার। বাইরের লোকেরা আমস্টারডামে এলেই এখানে আসবেই ও টুকিটাকি জিনিস কিনবেই।

আমরাও তেমন ছুটে ছুটে এখানে চলে এলাম এবং মনে পড়ে হল্যাণ্ড থেকে যেসব জিনিস কিনেছিলাম তার বেশীর ভাগই ভলেনডাম থেকে। ছেলেরা কালো বোনা পেন্টালুন পরে। তাতে বোতামের বদলে থাকে রুপোর ডাচ মুদ্রা গিলডার।

এখানে টুরিস্টদের পছন্দসই জিনিসের অনেক দোকান আছে। এইভাবে ছোট জায়গাটার আগন্তুকদের কাছ থেকে যথেষ্ট রোজগার বেশ লাগল দেখে। যদিও জানি এই সাজ-পোশাক, চলন বলন, সবই এ যুগে অবাস্তর, শুধু প্রয়োজনের খাতিরে সাজানো গোছানো।

রটারডামে এসে প্রথম এই ভাবটাই মনে এলো : এরা কি সব লোহার কার্তিক ? না রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ ? এদের উদ্যম কর্মক্ষমতা আত্মবিশ্বাস আর সবার উপরে ওপরয়ালার উপর পরম আস্থা যার কোন তুলনা নেই।

চোদ্দই মে, উনিশ শ চল্লিশ সালে নাৎসীদের বোমাতে তিরিশ হাজার বাড়ি, দোকান, চার্চ এবং স্কুল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিল। এই বিরাট ভগ্নস্তূপকে আবার স্বাভাবিক করে আনার কাজ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষে পোর্ট চালু হবার পর।

আপনারা কিন্তু এদের মনের শক্তির কথা শুনলে আশ্চর্য হবেন। ঐ রকম বীভৎস ধ্বংসকাণ্ডের ঠিক চারদিন পরই অত বড় বিরাট ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে ওরা এই পোর্ট আবার নূতন করে গড়ে তুলবার প্ল্যান আরম্ভ করেছিল। তারপরেই রটারডামের সোনার যুগ আরম্ভ হয়। এই হচ্ছে রটারডামের রূপকথা।

এরা অতীতকে নিয়ে বসে থাকে না। এরা ভবিষ্যতের দিকে সগর্বে সতেজে এগিয়ে যায়। আমাদের মত কি ছিলাম সেই চিন্তার মধ্যে মশগুল হয়ে বসে এইসা তেইসা ঝাড়ে না।

আমাদের দেশের উদ্বাস্তুরা কি করল ? গত তিরিশ বৎসর ধরে রাজা উজীর মেরেই কাটিয়ে দিল। আমার এত ছিল, তত ছিল। গরীব দেশবাসীর এমন আর কি থাকতে পারে ? যাদের সত্যিই মনুষ্যত্ব থাকে তারা পরের ঘাড়ে চেপে পরের জিনিস জবরদখল করে সগর্বে থাকতে পারে না। নিজের অন্ন, নিজের জমি যতই নগণ্য হোক তা অনেক বড়। সেই মনুষ্যত্ব আমাদের কোথায় ? আমাদের সরকারেরও সেই বিষয় সচেতন হতে হবে ও সবাইকে সজাগ করতে হবে।

রটারডাম এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরোপের পোর্ট হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। নৌকোতে করে ঘুরে ঘুরে

এদের কাজ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এরা ভবিষ্যতে আরও কত বড় হবে। এতটা পথ এগিয়ে এসেও এরা ক্লান্ত নয়, নয় শান্ত। যথেষ্ট করেছি, যথেষ্ট হয়েছে এই ভাবটা এদের নেই।

নিজের কথা, নিজের দেশবাসীর কথা মনে পড়ে যায়। এদের তুলনায় আমরা কি ভীষণ আলসে, কুঁড়ে।



সাত সকালে সাইকেলে

তাই আমাদের স্বাধীন ভারতের পথ-প্রদর্শক পণ্ডিতজী বলে-ছিলেন, "আরাম হারাম হ্যায়।" আমাদের দেশের জন্য এই বাক্য

বেদবাক্য। এই ভাব আমাদের দেহের রক্তে রক্তে যাওয়া দরকার। তা কি গেছে?

প্রাচীন দ্রষ্টারা যেমন বিরাট কথা উচ্চারণ করেছিলেন "সত্যমেব জয়তে" সেইরকম এই যুগের পণ্ডিতজী উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন, "আরাম হারাম হ্যায়।"

এখানকার মারিটাইম মিউজিয়াম থেকে অনেক কিছু জানা ও শেখা যায়। এখানে অসংখ্য রকমের জাহাজের মডেল আছে। নানা ধরনের ম্যাপ এটলাস্ গ্লোব আছে। বলতে গেলে খুব নামী শিপিং ইনস্টিটিউট এটি।

এই এত বড় ইন্ডাসট্রিয়াল কমপ্লেক্সে এসেও মনে হোল হল্যাণ্ড-বাসী সত্যিই ঘর বা পরিবারকেন্দ্রিক। সাত সকালে উঠে যে যার সাইকেল চেপে কর্মস্থানে চলে যায়। এমনকি ঘরের তৈরী স্যান্ডুইচ থাকে ব্যাগের মধ্যে। সন্ধ্যা ছ'টা সাতটায় বাড়ি ফিরেই রাতের খাবার খায়। তারপর বেশীর ভাগ দিনই বাড়িতে থাকে।

এখানে বেশীর ভাগ কাগজ বের হয় সন্ধ্যাবেলা—কারণ লোকেরা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে কাগজ পড়ে। এবং অল্পে সন্তুষ্ট। বাড়িতে বসে টেলিভিশন বা রেডিও শুনেই আনন্দ পায়। এ ওর বাড়িতে যায়।

হল্যাণ্ডের দক্ষিণে বেশ মজার একটি ছোট গ্রাম আছে যেখানে নিয়ম না মানাটাই নিয়ম। নাম হচ্ছে বার্ল-নাসাউ বার্ল-হারটগ্। এখানে ডাচ ও বেলজিয়ানরা একসঙ্গে বাস করে।

নাসাউর দিকটাতে থাকে সাড়ে চার হাজার লোক। তারা হচ্ছে ডাচ এবং ডাচ আইনের মধ্যে পড়ে। হারটগ্ দিকটাতে আছে দুই হাজার বেলজিয়ান, তারা বেলজিয়ান। আইনের মধ্যে পড়ে। এরা রাজা বদোঁয়ার প্রজা। এখানকার রাস্তার চৌমাথা হচ্ছে ডাচ। কিন্তু পাব এবং চার্চ হচ্ছে বেলজিয়ান। প্রত্যেক রাস্তাই বলতে গেলে অর্ধেক ডাচ ও অর্ধেক বেলজিয়ান।

এমনকি কিছু বাড়ির অর্ধেক ডাচ এলাকাতে, কিছু বেলজিয়ামের মধ্যে।

এখানে ট্যাক্স যারা নেয় তাদের সুবিধার জন্য ডাচ বাড়ির লোকেরা নীল রং-এর উপর সাদা দিয়ে নম্বর লিখে রাখে আর বেলজিয়ামের বাড়ির লোকেরা সাদা রাং-এর উপর কালো দিয়ে নম্বর লিখে রাখে।

একই দোকানের তু'দিকের জিনিসের দাম তুরকম। এখানকার বেশীর ভাগ লোকেরাই তু-দেশকেই ট্যাক্স দেয়। আবার সুবিধামত তু-দেশকেই ফাঁকি দেয়। বেশ এক মজার ব্যাপার। যাকে বলে হ, য, ব, র, ল।

লোকেরা নিশ্চয়ই প্রার্থনা করে যে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম যেন এক হয়ে যায়। আবার করেও না বোধ হয়: কেননা তবে ত সত্যিই ট্যাক্স দিতে হবে। এখন ত বেশ ফাঁকি দিতে পারে।

তাছাড়া এইটুকু গ্রামে ত আর জেলখানা নেই। আর হবেও না কোনদিন। নিশ্চিন্ত যে কারও আইন ফাঁকি দেবার জন্য জেল খাটতে হবে না।

এমন মজার দেশের কথা কেউ কোনদিন শুনেছে না দেখেছে?

আমি ত প্রথম বিশ্বাস করিনি। দেখে ত চক্ষুস্থির। সবই হয় ও আছে এই ভগবানের রাজ্যে।

এই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে যেমন আমরা তুটি বিপরীত ধর্মী সৌন্দর্য দেখি ঠিক সেইরকম সবদিকেই আমরা তাই দেখতে পাই। দক্ষিণ দিকটি যেমন "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাম্" উত্তর হচ্ছে তুর্গম গিরি ও ঘন অরণ্য আর হিম তুষার। একদিকে যেমন অতি আধুনিকভাবে ইন্ডাসট্রিয়ালাইজড অন্যদিকে দেখতে পাই পুরোনো দিনের শিল্পকলার কাজ সুনিপুণভাবে চলছে।

এখানে সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন মানে সোস্যাল রিফরম্ যা হয়েছে তা পৃথিবীর আর কোন দেশে হয়নি। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে এদের সৌহার্দ বা নৈকট্য যাই বলুন না কেন অনেক বেশী।

এইজন্যই বোধহয় ইংরাজী অনেক শব্দ এদের ভাষার মধ্যে ঢুকে

গেছে—যেমন, arm, hand, man, son ইত্যাদি। কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও কিছু কথা ঢুকেছে—lockout, okay, knock out ইত্যাদি। এখন এর লিস্ট দিতে বসলে আমি জানি সকলের মাথা ধরে যাবে বা ঘুম পাবে। তাই এর ফিরিস্তি এখানেই শেষ করলাম।

এদের যেমন ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে ভাষার আদান-প্রদান হয়েছে, আমাদেরও আদান-প্রদান হয়েছে। ভাষার কথাই বলছি। বড় তিক্ততার মধ্য দিয়ে, দাসত্ব ও প্রভুত্বের মধ্য দিয়ে। তবে এখন আমরা স্বাধীন। তাই আমরা পুরোনো কথা ভুলে এটাই ভাবতে পারি যে সব সময়ই সব ভাষার প্রসার বা উন্নতি হয় দেওয়া নেওয়ার মধ্যে দিয়ে। যে কথাটা আমাদের চালু হয়ে গেছে, সর্বসাধারণ বোঝে সেটা নিজের মনে করে নেওয়াই ভাল। পরের মনে করে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব।

কোন দেশে গেলে তার রাজধানী না দেখে ফেরা যায়? তিনজনে মিলে হ্যাগের দিকে রওনা হলাম। এই শহরের আসল নাম মানে সরকারী নাম হচ্ছে এস্-গ্রাভেনহাগ।

জার্মানদের দেওয়া নাম হচ্ছে দেন হাগ। হল্যাণ্ডের লোকেরা এই নামটাই বেশী পছন্দ করে।

এখানে প্রথম গোড়াপত্তন করেন কাউন্ট দ্বিতীয় উইলিয়াম। উনি একটি দুর্গ তৈরী করেন। আস্তে আস্তে সরকারী কাজকর্ম এখানে হতে আরম্ভ হয়। আঠার শ নিরানব্বই খৃষ্টাব্দ থেকে মাঝে মাঝেই আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হতে থাকে।

এখানে পার্লামেন্ট বসে। রাণী জুলিয়ানা যদিও তার স্বামী রাজকুমার বার্নার্ডকে নিয়ে থাকেন হিলভারসামে, সোয়েসটিক প্রাসাদে। রাণীকে অবশ্য সমানেই যাতায়াত করতে হয়।

এখানে ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাসটিস্। তার নাম হচ্ছে পীস প্যালেস।

প্রথম কনফারেন্স হয় আঠার শ নিরানব্বইতে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অনুরোধে। আমেরিকার মিলিয়নিয়ার এনড্রু কার্নেগি পনের লক্ষ ডলার এই কোর্টএর বাড়িটি তৈরী করবার জন্য দিয়েছিলেন।

ডাচ সরকার দেয় জমিটা। স্পেন দিয়েছিল রুপোর সব দোয়াত, লোহার গেটগুলো দিয়েছিল জার্মেনি, সাইবেরিয়ান মার্বেলের কলস পাত্র দিয়েছিল রাশিয়া. পর্দা সব দিয়েছিল ফ্রান্স থেকে, চীনামাটির ফুলদানি সব চীন থেকে।

যখন কোর্ট বসে পনের জন জুরি আসেন পনেরটি দেশ থেকে। কোর্ট তখনি বিচার করতে পারে যখন দুই দেশই বা দুই পক্ষই বিচার চায়। এই পীস্ প্যালেসে এসে মনে হয় মানুষের আত্মা সত্যিই চায় ন্যায়। তবুও যেন সে অন্যায় না করে পারে না।

উপলব্ধি করে "সোঽহম্," কিন্তু মনে রাখতে পারে না। আশা করে পারবে। চেষ্টা করে। হাজার হাজার বৎসর ধরে চেষ্টা করে চলেছে। তাই ছোট্ট একটা দেশে ন্যায় বিচারের জায়গা তৈরী করেছে, সারা পৃথিবীর অন্যায়ের বিচার হবে এখানে। কত বড় আশা।

মরিসট্হুইস মিউজিয়াম এখানে খুব নাম করা। এখানে রেমব্রাণ্টের পনেরটি ও ভারমিয়ার-এর তিনটি ছবি আছে। তাছাড়া ডাচ বড় বড় চিত্রকর সকলের যেমন পটার, হাল, রসভাম ইত্যাদির আছে। রুবেন্স, ভ্যালডাইক, ওয়েডেন, হলবিন ইত্যাদিরও আছে।

বাড়িটা ষোল শ চুয়াল্লিশের তৈরী। ডাচ রেনেসাঁসের সময়কার উৎকৃষ্ট স্থপতিবিদ্যার প্রতীক। এখানকার শেষ দ্রষ্টব্য দেখলাম মাদুরোদাম, হল্যাণ্ডের মিনিয়েচার সিটি। এই সিটির নামকরণ হয়েছে লেফ্টেনাণ্ট জর্জ মাদুরোর নামে। উনি ডাচাউ কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে উনিশ শ চল্লিশ খৃষ্টাব্দে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। এর থেকে যে লাভ হয় তাতে লায়েনের ছাত্রদের সানেটরিয়াম চলে।

এর মেয়ের হচ্ছেন রাজকুমারী বিয়েট্রিক্স। উনিই এখন রাণী হয়েছেন তাঁর মার পরে। এখানে হল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেকটি নাম-করা প্রাসাদ আছে। একটি বড় শহরে যা থাকে বা থাকতে পারে সবই এখানে আছে। বন্দর, হারবার এবং তার যাবতীয় সব কিছুই আছে। তাছাড়া আছে কার, বাস, প্লেন, এয়ারপোর্ট, ছোট গলি, বড় রাস্তা, মানুষ, সব কিছুই চলছে। প্লেন ছাড়ছে, গাড়ি চলছে, স্টীমার ছাড়ছে। সব আওয়াজে একেবারে যেন স্বাভাবিক একটি শহর। সত্যিকারের যা সাইজ, তার পঁচিশ ভাগের একভাগ সাইজের খুদে স্কেলে তৈরী।

মিনিয়েচারের মধ্যে মাধুর্য। অনির্বচনীয়।

১৫

বেলজিয়াম আমার মনের মধ্যে একটা রেখাপাত করেছিল। তখন আমার বয়স অল্প। খুব ছোট নয়, যাকে বলে স্বপ্ন দেখার বয়স।

যে বয়সে ছেঁড়া কাপড় পরেও মেয়েরা রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখে, যে বয়সে টাকা রোজগার করা কত কঠিন বা রোজগার করলেও রাখাটা কত কঠিন তা না বুঝেই দান করব বড় দাতা হব সেই চিন্তায় আকাশ পাতাল এক করে ফেলে, সেই বয়সটা।

সোনার বয়স। পরের এতটুকু দুঃখতে চোখের কোণে জল টলটল করে ওঠে।

সেই সময় দেখেছিলাম বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের ও রাণী এসট্রিডের বিয়ের ছবি। কি সুন্দর দেখতে দুজনে। এক দেখাতেই মন আমার ওরা কেড়ে নিয়েছিল। বারে বারে মনে হয়েছে আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর যদি সত্যিকারের রাজারাণী এইরকম দেখতে হয়। ওরা যেন ঠাকুমার ঝুলি থেকেই বেরিয়ে এসেছিল। এমনি রূপ, এমনি ভালবাসা।

তার অল্পদিনের মধ্যেই কাগজে উঠল রাণী এসট্রিড মটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। জেনে মনে এত কষ্ট হয়েছিল। মনে পড়ে বোধ হয় দু ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়েছিল। ভেবেছিলাম পৃথিবীতে এত অসংখ্য লোক থাকতে গোলাপ ফুলের মত দেখতে সে কেন মারা যাবে?

তারপর কত বছর কেটে গেছে। কবে কি করে বেলজিয়াম মন থেকে মুছে গিয়েছিল তার ঠিক নেই। আর দশটা দেশের মতই এই দেশের কথা পড়েছি।

লণ্ডনে এসে যখন দেশ দেখতে বের হলাম হঠাৎ দেখি মনের খনি থেকে অল্প বয়সের চিন্তাটা এসে মন জুড়ে বসল! বেলজিয়াম না দেখে যাব না।

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে পৌঁছে একটা জিনিস চোখে পড়ল। নূতন ও পুরোনোর সমন্বয়। মানে ইউরোপের বেশীর ভাগ দেশই একেবারে নূতন রূপ নিয়েছে। আগের কিছুই যেন বিশেষ চোখে পড়ে না—এখানে কিছু তা নয়। এই নূতন ও পুরোনোর মিলে মিশে এক হয়ে থাকায় এর একটা আলাদা আকর্ষণ হয়েছে।

সব দেশের লোকই এখানে আসার জন্য ব্যগ্র হয়। যা সচরাচর দেখা যায় না তাই মানুষ চায় দেখতে।

এখানে আসছি শুনেছি কয়েকজন ইংরেজ বন্ধু বলল, "ওখানে যাচ্ছ, খেয়ে সুখ পাবে।" বুঝলাম এদেশের রান্না ইংরেজদের খুবই ভাল লাগে। সেটা বোধহয় একটা বিশেষ কারণ এদেশে এত ইংরেজ টুরিস্ট আসার। আমেরিকানও আসে অজস্র। আমেরিকার প্রভাব এখন ইউরোপে খুবই বেশী। যাকে বলে আমেরিকান ওয়েভ।

মনে মনে অনেকেই তাদের পছন্দ করে না, কিন্তু তাদের মত হবার আকাঙ্ক্ষাটা ষোল আনার উপর আঠার আনা।

এটা ঠিক যে ডাচ বা ফ্রেঞ্চ প্রভাব ওদের ওপর একটুও পড়েনি, যদিও এত কাছে।

বোধহয় এটাই স্বাভাবিক। আমরা মানে, বাঙালী, ওড়িয়া, আসামী এত পাশাপাশি থেকেও কত আলাদা।

এখানে হঠাৎ এসে পৌঁছালাম, মানে লাক্সেমবার্গ থেকে যে এত কম দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারব তা ঠিক ভাবিনি। যাই হোক এসে কপাল গুণে ভাল রাস্তার উপর সুবিধামত হোটেলে জায়গা পেয়ে গেলাম।

এত ঘুরে ফিরে এসে একটা কথা সত্যিই বড় অদ্ভুত লেগেছে। দেশ ভ্রমণে কখনও কোন কষ্টভোগ করতে হয়নি। এমনকি থাকার ব্যবস্থাও সব সময়ই ভাল হয়েছে। একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন, আপনার চতুর্থপতি জোরদার ও ভাল ঘরে আছে, তাই আপনার যানবাহন বা ভ্রমণ ইত্যাদি খুব ভালভাবে হবে।

এটা এই পর্যন্ত জীবনে অবশ্য বেশ মিলেছে। তাই মনে হয় কোন জিনিসই অবজ্ঞা করা যায় না। যদিও আমাদের দেশের সব শাস্ত্রের আরও অনেক গবেষণা দরকার।

হোটেলে পৌঁছালাম রাতে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে। তাই আর বাইরে যেতে না গিয়ে সেইখানেই রাতের খাওয়া সারলাম। বিছানায় বসে বসে এক রেগুলার গবেষণা আরম্ভ হোল কোথায় সব চাইতে আগে যাওয়া।

প্রথমেই মনে হোল "ওয়াটারলুতে" যাওয়া দরকার। আমি ছোট থেকেই ইতিহাস পড়তে ভালবাসি। এমনকি অনেক সময় নাটক নভেল রেখে পড়তাম জীবন্ত মানুষদের কাহিনী। বন্ধুদের বলতাম, বানানো নায়ক নায়িকাদের কথা কখনো জীবন্ত নায়িকা নায়কদের চেয়ে মর্মস্পর্শী হতে পারে?

নেপোলিয়ান ছিলেন আমার ঐতিহাসিক বীরপূজার মূর্তি, সর্বগুণে গুণান্বিত পুরুষ। যেমন ছিলেন বীর তেমনি ছিলেন গণিত শাস্ত্রে পণ্ডিত। জীবনে শুধু যুদ্ধ করে গেছেন বলে তাঁর অন্য গুণগুলি চাপা পড়ে যায়।

এত বড় বীরের শেষ জীবনটা এত দুঃখের বলেই বোধহয় লর্ড

ওয়েলিংটনের ওয়াটারলুতে জয়টা আমি ঠিক খোলা মনে নিতে পারিনি। শুধু মনে হয় যুদ্ধ করতে করতে ত উনি মারা যেতে পারতেন।

এই যুদ্ধক্ষেত্রে একটা সিংহের মূর্তি আছে। এর কাছেই মুজিও কেইলু নামে একটা মিউজিয়াম আছে। নেপোলিয়ান তার জীবনের একটা নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছেন এখানে।

ওখান থেকে আবার আমরা ফিরে এলাম শহরের মধ্যে। মনে হোল আগে শহরটা ভাল করে দেখে বাইরের সব পরে দেখব।

শহরে কাফের অন্ত নেই। পথে বের হলেই দু কদম যেতে না যেতেই একটা করে কাফে। এখানকার লোকেরা কফি বিয়ার আর পোর্ট ওয়াইন খেতে খুব ভালবাসে। ঠিক আমাদের কলকাতার মিষ্টির দোকানের মত। দু কদম বাড়ালেই মিষ্টির দোকান। তাই ত সবাই বলে বাঙালীরা মিষ্টির ভক্ত।

এখানকার লোকেরা আলু ভাজা খাবার যম।

সর্বত্র এই ছোট ছোট কাফে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

লম্বা লম্বা করে আলু পিস করে কেটে ফ্যাট বা তেলে ভাজা হচ্ছে। যেতে যেতে লোকেরা কিনে মুখে দিচ্ছে।

এই জিনিসটি এদের বড় প্রিয়!

ইংরেজরা মাছের ফ্রাইয়ের সঙ্গে এইভাবে আলু ভাজা খায়। ফিশ অ্যাণ্ড চিপস্, আহা কি মজার ভোজন।

এরা শুধু শুধুই খায়। এখানে আলু ভাজা কিনতে পয়সা লাগে বেশী, অন্য দেশের তুলনায়। হলে হবে কি? তাই তারা সোনা তোলা করে খাচ্ছে। আপরুচি খানা যাকে বলে।

আরও একটি দামী খবর আপনাদের না দিলে নিজে চিরকালের অপরাধী হয়ে থাকব।

এরা অদ্ভুত রকম শীতকাতুরে। সব সময়ই ভয়ে জুজু কখন গিটে গিটে ব্যথা ধরবে। তাই তাদের অফিস, কাফে, বসবার ঘর ভীষণ গরম করে রাখে।

জানলা ভুলেও খুলবে না।

খুব গরমের সময় ও ট্রেনের কামরাতে যদি কেউ জানলা খুলতে চায় রেগুলার যুদ্ধ বেধে যাবে। গার্ড এলে অবশ্য ফয়সালা করবে ঠিকই।

জানলা-খোলা চলবে না। তা হচ্ছে অস্বাভাবিক। ব্যাস, স্বাভাবিক লোকদের জিত।

ওখানে ডেমোক্রেসীর কোন পথ নেই। থাকলেও কোন লাভ হোত না।

সকলেই ত প্রায় শীতকাতুরে।

পথে চলতে চলতে বেশ বোঝা যায় লোহার উপর সূক্ষ্ম কাজ করবার ক্ষমতা এদের অসীম। যুগ যুগান্তর ধরে এই কাজে তারা হাত পাকিয়েছে। আমার দেশে যেমন মাটির কাজের তুলনা নেই। তফাৎ এই যে লোহার উপরের কাজ নষ্ট হয় না। তাই অনেক আগের কারুকার্য আমরা পাই। কিন্তু মাটির ওপর কাজ ক্ষণভঙ্গুর।

অনেক রাস্তাই এখানে পাথরের। তাই বাইরে থেকে যারা আসে অনেককেই প্রথমেই এসে জুতোর দোকানে যেতে হয়। হিল্‌তোলা জুতো পরে এখানে হাঁটা অনেক সময়ই মুশকিল। তবে আজকাল ত সত্যিকারের ফ্যাসান হচ্ছে। খড়মের মত গোড়ালি অর্থাৎ হিল, মানে সবটাই সমান করে উঁচু।

হঠাৎ একটা মজার কথা মনে পড়ল। ব্রাসেলসের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খড়মের মত জুতো পরা। চারটা ছেলেমেয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের কি দুর্গতি, হিলতোলা জুতো পরে। শেষ পর্যন্ত শুধু মোজা পায়ে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে চলে প্রথম জুতোর দোকানে ঢুকে পড়ল।

তাই আমার মনে হয়েছিল টুরিস্টদের কাছ থেকে জুতোর দোকানীরা বেশ দু'পয়সা করে নেয়।

এখানকার মার্কেটও দেখবার মত, কারণ একই জায়গাতে আলাদা আলাদা জিনিস নিয়ে লোকে বিক্রি করতে বসে। সকালে

শাক-সব্জি আশপাশের চাষীরা আসে বিক্রি করতে। বেলা একটা থেকে সেই একই জায়গা হয়ে যায় ফুলের বাগান। নানা রকম ফুল হরেক ভাবে সাজান। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ফুল ও ফুলের গাছগাছড়া বিক্রীত হয়। আবার সেই জায়গাই রাতে পরীর দেশের মত সুন্দর করে ফ্লার্ড লাইট দিয়ে সাজানো হয়।

রবিবারের সকালটা হচ্ছে এর ব্যতিক্রম। তখন নানারকমের পাখি বিক্রি হয়। আমার দেখে দেখে অবাক লেগেছিল একটা জায়গাকেই এরা কত ভাবে ব্যবহার করে।

সব্জী বিক্রির পরই স্বাভাবিক নোংরা জায়গাটা চোখের পলকে ওরা কি সুন্দর পরিষ্কার করে ফেলে। সত্যিই কাজ করবার ফুসমন্তর ওদের জানা।

ওখানকার সেন্ট নিকোলাসের ছোট্ট চার্চে গিয়ে জানলাম যে সব মেয়েরা নাচ শেখে বা নাচে, মানে ব্যালেরিনারা এখানে এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে—ভাল জায়গাতে যাতে নাচের সুযোগ পায়।

এই কথা শুনে অনেকদিন আগের দিল্লীর কথা মনে পড়ল। মেয়ে যখন প্রথম বৎসর প্রথম স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে দ্বিতীয় মানে উঠবার জন্য পরীক্ষা দিতে যায় পথে হনুমানজীর ওখানে পুজো দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রার্থনা করেছিলাম ও যেন প্রথম হয়।

দিল্লীতে কথা আছে, সবচাইতে জাগ্রত মন্দির হচ্ছে হনুমানজীর মন্দির। যাই হোক পুজোর ফল পেয়েছিলাম ও মনে এক দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে ওখানকার পুজো কোন সময় বিফল হয় না।

দিল্লীতে থাকতে তাই সবকিছুর জন্যই গেছি দৌড়ে সেখানে।

ওখান থেকে চলে আসার পর যে কোন সংশয়ের সময় সেই মন্দিরটার অভাব বড় অনুভব করি। সাধারণ মানুষ চায় নির্ভর করতে।

এই শহরে কত যে গীর্জা আছে তার সীমা সংখ্যা নেই। তাছাড়া সব সময়ই মনে হয় যেন গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। বড় সুন্দর স্নিগ্ধভাব

এনে দেয় মনে। আমাদের দেশের সামগান বা সংস্কৃত গানের প্রভবা ঠিক এইরকম। তখন মনে হয় একটা জায়গাতে বোধহয় আমরা সবাই এক—পেরু থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত।

এগ্লিস দেল্সা চ্যাপেলে (গীর্জায়) গিয়ে একটা খুব সুন্দর মূর্তি দেখলাম। আওয়ার লেড়ী অড সলিচুড, মাথায় কাল রং-এর লেসের ওড়না। এটা বলে স্পেনের বিখ্যাত স্থপতি বেকেড়ার তৈরী। এরকম কথা আছে যে এই মূর্তিটা ইনফ্যানটা ইস্পয়োনর। তাকে বলা হোত তার বাবার চোখের আলো। তিনি এখানে এসেছিলেন। এই রাজকুমারীর বাবা দ্বিতীয় ফিলিপ তার মৃত্যুর আগে এই মেয়েকে এই দেশটা দিয়ে যান।

এখানে দুটি চিত্রকলার মিউজিয়াম দেখার মত। তাছাড়া একটা খুব সুবিধে, একেবারে পাশাপাশি।

মিউজিয়াম ক্দে-স্সা রিজে আমরা পাই বেলজিয়ামের নামী ফ্লেমিশ শিল্পীদের নামকরা চিত্র, যেমন ভ্যান ডার ওয়েডেন। তাছাড়া অন্যান্য শৈলীর নামী শিল্পীদের আঁকা ছবি ওখানে আছে। যেমন বাউট্রস্ বশ্, রুবেন্স্, ভ্যানডাইক ইত্যাদি।

পাশেই মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্ট। এখানে উনিশ-বিশ শতাব্দীর শিল্পীদের ছবি, যেমন লরেন্স ডেভিড, গর্গ্যা। তাছাড়া বেলজিয়াম শিল্পীদেরও আছে।

এখানে কত কিছুর মিউজিয়াম আছে। তাদের সংখ্যাও যেমন অনেক, জিনিসও নানা ধরনের।

আর কোন মিউজিয়ামে যেতে মন চাইল না। মনে হোল এই গোলকধাঁধার মধ্যে যদি হারিয়ে যাই তবে নিশ্চয়ই কত না দেখবার জিনিস না-দেখা থেকে যাবে।

ছোটবেলার গল্প মনে পড়ল। কে জানি রুপোর পাহাড়ে ঘুরতেই জীবন কাটিয়েছিল। পড়ে রইল তার সোনার পাহাড়ে পৌঁছানো আর হীরের পাহাড় অবধি যাওয়া।

আমরা কুডেনবার্গ প্রাসাদে গেলাম। এটা বানিয়েছিলেন

ফিলিপ দি গুড। তাঁর সময়ে এই দেশ সবদিকেই নাম করেছিল। সেই যুগে পেন্টিং লেসের কাজ ও হাতের নানারকম কারুকার্যে খুব নাম হয়েছিল।

এ দেশের ইতিহাস পড়লে মনে পড়ে যায় দুর্ভাগা ভারতবর্ষের কথা। যুগ যুগ ধরে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়া। এক প্রভু থেকে আরেক প্রভু।

এই দেশ কখনও স্পেনের হাতে, কখনও ফ্রান্সের হাতে, কখনও অস্ট্রিয়ার হাতে। এইভাবেই এই দেশের ভাগ্য ঘূর্ণীয়মান লাট্টুর মত ছিল। আঠার শ তিরিশে প্রথম উইলিয়ামের সাহায্যে ডাচদের হাত থেকে স্বাধীন হয়, এবং বেলজিয়াম দেশের জন্ম হয় ব্রাসেলসকে রাজধানী করে।

এখানকার লোকদের দিকে তাকালে মনে হয় এরা কত পোড়-খাওয়া। প্রত্যেক মানুষ যেমন আলাদা আলাদা ভাগ্য নিয়ে আসে প্রত্যেক দেশও তাই। আগের জন্মের কর্মফলে মানুষ তার ভাগ্য গড়ে, ভাঙে।

কিন্তু দেশের ভাগ্য কি করে ঠিক হয় বুঝি না। এক দেশ যুগ যুগান্তর ধরে কত লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যায়। আবার কোন দেশ দেখি অনেকটাই আয়েসে তার ভাগ্যের চাকা ঘোরে। কেনর প্রশ্ন এখনও পাইনি।

লাকেন এ গিয়ে খুব ভাল লাগল; ওখানকার গ্রাম্য হাউসগুলো দেখে। রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড উনিশ শতকে প্যারিসের মেলা থেকে চাইনিজ পেভিলিয়ান এবং জাপানিজ টাওয়ার কিনেছিলেন। সেগুলো এখানে সুন্দর করে রাখা আছে। এর কাছাকাছি নেপচুনের একটি সুন্দর প্রতিমূর্তিও আছে।

এই দেশে সমানে যুদ্ধ চলেছে বলেই এখানকার মিউজিয়াম অফ আরমি থেকে অনেক কিছু জানা যায় ও শেখা যায়।

এসব দেখতে দেখতে বারে বারে মনে হচ্ছিল ভগবান যখন পৃথিবীটা বানান তখন বোধহয় বেলজিয়ামকে যুদ্ধক্ষেত্র করেই

বানিয়েছিলেন। না হলে এত যুগ ধরে এখানে এত যুদ্ধ হবেই বা কেন।

সব দেশের মত এ দেশেও রাজপ্রাসাদ আছে দেখবার মত। তাছাড়া আছে পার্লিয়ামেণ্ট, সরকারী অফিস, একাডেমী অফ সায়ান্স আর্টস অ্যাণ্ড লেটার্স সুন্দর কারুকার্য করা। এখানকার সেণ্ট মাইকেল ও সেণ্ট গুডুলের গীর্জায় গিয়ে এক অদ্ভুত গল্প জানলাম। ইং ১০৪৭ সালে সেণ্ট গুডুলের অস্থি নিয়ে আসা হয় এবং তার নামে গীর্জা বানানো শুরু হয়। গুডুল নামে এক দেবীর মত ছোট মেয়ে লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। জোর বাতাসে তা নিভে যায়, কিন্তু মেয়েটির প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছায় ও আপনা থেকেই লণ্ঠনটা জ্বলে ওঠে।

তারপরই দেখতে যাই দি রু রয়্যালে। এখানে স্বাধীন বেলজিয়ামের প্রথম ন্যাশনাল এসেমব্লী আঠার শ একত্রিশ সালে বসেছিল। তার পাশের এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের স্মরণে। স্মৃতিস্তম্ভের দুদিকে দুটি ব্রোঞ্জের সিংহের মূর্তি।

সেইখানে যেটা সব চাইতে প্রথমে চোখে পড়ে তা হোল স্বাধীন দেশের প্রথম স্বাধীন রাজা প্রথম লিওপোল্ডের অপূর্ব মূর্তি।

এখানকার বোয়া দ্য লা কাম্বেঁা হচ্ছে জনগণের পার্ক, মানে পাবলিক পার্ক। এই পার্কের মধ্যে অনেক সুন্দর কাফে আছে। যেখানে গরমের সময় খোলা আকাশের নিচে আছে রোলার স্কেটিং-এর রিং ও নাচবার ব্যবস্থা।

শহর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে বোয়া দ্য লা ক্যাম্ব্রে। এই জায়গাটা যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর সুন্দর স্মার্ট রেস্টুরেণ্টে ভর্তি আর আছে সুন্দর সাধারণ অতিথিশালা।

ব্রাসেলস থেকে সাত মাইল দূরে আছে গাসবিক্ দুর্গ। কয়েক বৎসরের আগে তৈরী। এতে পাওয়া যায় মধ্যযুগের অবস্থাপন্ন লোকেদের থাকার ধরণ। এখানকার আসবাবপত্র, চিত্রাবলি, কারু-

কার্য খচিত কার্পেট ও পর্দা ইত্যাদি, সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে যে সবাইকে যেন সেই যুগে টেনে নিয়ে যায়। রাখা আছে অতি যত্নে।

মনে হয় ওখানে যেন লোকেরা বাস করে। এই দুর্গের মালিক যখন দুর্গটি সরকারের হাতে তুলে দেন তখন এই শর্ত করেছিলেন যে এখানে ঢোকার জন্য যেন মাশুল নেওয়া হয়। সেই মাশুল দিয়ে যেন এটা যেমনটা দিচ্ছি ঠিক সেইভাবেই অতি যত্নে রাখা হয়। সরকার তার অনুরোধের দাম দিয়েছে।

বিশেষ করে আরও একটি ব্যাপার চোখে পড়ল। বাড়ির সামনের প্রস্থ (ফ্রন্টেজ) এখানে বেশ কম। প্রত্যেকটি বাড়িই যেন লম্বা ভাবে ফালি করা।

অবাকই হলাম। তবে আমাদের দেশেও অবশ্য এরকম লম্বা ফালি করা জমি আছে। প্রশস্ত ফ্রন্টেজওয়ালাও সংখ্যায় কম নয়।

যাকে বলে মেলানো মেশানো। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে একটি পথচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কারণ শুনে প্রথম অবাক, তার পর সবাক। এমন কথা ত কখনও শুনিনি, ঠিক বলছ ত ?

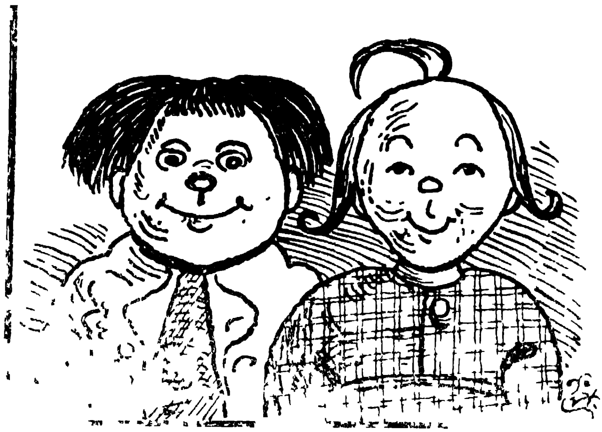
"অঠিক বলব কেন ? তাছাড়া যুক্তিটা তোমার মনে ধরল না ? রাস্তা পরিষ্কার রাখার কত সহজ উপায়। তোমার বাড়ির সামনের রাস্তাটুকু পরিষ্কার রাখার দায়দায়িত্ব অনেকটা তোমার হাতে। তোমার বাড়ির সামনের রাস্তায় যদি কোন কিছুর খোসায় পা লেগে কারও পা মচকায় তার জন্য দায়ী তুমি। তার জন্য খেসারতও দিতে হতে পারে।"

"এ আবার কি ? রামের দোষ শ্যামের ঘাড়ে ? যত্তো সব আধিখ্যেতা !"

"তা ঠিক। তবে রামকে খুঁজে তুমি কোথায় পাবে বল। তার চাইতে এই ব্যবস্থা অনেক সহজ। তাই লোকেরা বাড়ির সামনেটা যত কম চওড়া হয় তাই চায়। দায় কম।"

তা মন্দ বুদ্ধি নয়।

তখন মনে পড়ে গেল নিজের দেশের কথা। সেখানে মানুষ যেভাবে দিনরাত রাস্তায় ময়লা ফেলে ওখানে এরকম নিয়ম হলেও



যত্তো সব আধিখ্যেতা।

বাড়ির গিন্নির ঝাটা হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বাড়ির সামনে। মাথায় উঠবে বাড়ির ভেতর পরিষ্কার রাখা।

এখানকার কথা আলাদা। লোকরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ।

এখানে যে নিয়ম চলে আমাদের ওখানে তা চলবে না।

রাজধানীর দশ মাইল দূরে কটি অদ্ভুত গীর্জা আছে। অদ্ভুত মানে দেখার কথা বলছি না। এর কিংবদন্তির কথা বলছি। সেণ্ট মার্টিনের নামে উৎসর্গীকৃত লা ভিরজ নোয়া চার্চে যার মূর্তি আছে তিনি এই দেশকে ফিলিপ অভ ক্লিভের হাত থেকে বাঁচান। এর কারুকার্য থেকে বেশ বোঝা যায় তার থেকে পনের শ শতাব্দীর সময়কার স্থাপত্যের ধারা। রেনেসাঁসের ছোঁয়া বলতে গেলে শুধু এই চার্চের কারুকার্য থেকেই পাওয়া যায়।

এখান থেকে আমরা গেলাম নিভেলে নামে একটি শহরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই শহরটা একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল।

নিভেলের মেয়ে সেণ্ট গারট্রুড মেয়েদের বিরাট মঠ তৈরী করেছিলেন। সম্রাট শার্লেমেনের বংশের মেয়ে সেণ্ট গারট্রুডের মঠ ঐশ্বর্যে, সুনামে এবং ক্ষমতাতে খৃষ্টানদের জগতে সবচাইতে উচ্চে স্থান পেয়েছিল। খুব ভাল পরিবারের মেয়ে না হলে এখানে ঢুকতে দেওয়া হোত না। সেণ্ট গারট্রুডের অস্থি নিয়ে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক প্রশেসন করে আট মাইল পথ পরিক্রমা করত। সেই সেণ্টের মহিমা এক হাজার বৎসর ছিল। তারপর আস্তে আস্তে তা লোকের মন থেকে মুছে যায়।

এই দেশে অনেক নামী ও গুণী লোকের জন্ম হয়েছে। বড় বড় কবি, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদি। তাই এই দেশে এসে এই ছোট শহরটা মনকে টানছিল দেখবার মত।

এখানকার মাটিতে কি আছে, বাতাসে কি আছে, আলোতে কি আছে, যা এ দেশের অন্য শহরে নেই? নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার জন্য এত জন নামী লোকের জন্ম দিতে পারে।

তখনই মনে পড়ে নিজের দেশের কথা, তার আকাশে, বাতাসে, আলোতে, মাটিতে কি আছে জানি না যার জন্য এত মহামানবের জন্ম হয়েছে। রাজা রামমোহন, গান্ধী, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি।

অনেক ঘুরে, অনেক দেখে ও জেনে হোটেলে ফিরে গেলাম। দেহ যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মনও চাইছিল বিশ্রাম।

ঘরে ফিরেই মনে হোল শরীর জুড়িয়ে গেছে। সত্যিই কি রকম আশ্চর্য লাগে মানুষের মনের ধারার কথা ভাবলে। পথে যখন মনে হয় শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ঘরে ফিরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রান্তি কেটে যায়। সেই সাময়িক ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু।

ব্রাসেল্‌সের হোটেলেই এক গল্পে লোকের মুখ থেকে আন্টোয়ার্প এই নামকরণ কেন হয়েছিল সেই গল্প শুনছিলাম।

আশ্চর্য লাগল ভাবতে হাজার হাজার মাইল দূরে আমার দেশেও ত কত কিংবদন্তি আছে নানা দেশের নামের পেছনে।

মন ঠিক হয়ে গেল এখন নেকস্ট পোর্ট অব কল হবে আন্টোয়ার্প।

মেয়েকে বললাম, এখান থেকে এদেশের কোন ছেলে বা মেয়েকে সঙ্গী হিসাবে জোটাতে পারলে বেশ হোত, তাই না?

"তুমি কি মনে কর যে আমি সেই সন্ধানে ছিলাম না?" বলল অনু। বেরিয়ে পড়া যাক। পথে বিপথে পাওয়াও যেতে পারে। তবে আমরা তিনজনেই বা কম কিসে?

কোচে উঠবার আগে টক করে আপনাদের গল্পটি বলছি।

রোমানরা যখন এই দেশে রাজত্ব করত, সেই সময় ড্রয়ন অ্যান্টিগণ নামে এক দানব এই দেশের ওপর অধিকার বিস্তার করেছিল। যত জাহাজ এখান দিয়ে যেত সকলের কাছ থেকে কর আদায় করত। যারা দিতে না পারত তাদের ডান হাত কেটে ফেলে দিত। "To throw a hand" ফ্লেমিশ ভাষায় হচ্ছে "hand werpen"। 'ডি'টা টি হিসাবে উচ্চারণ হয় এই ভাষায়। সেই থেকেই এই দেশের নাম হয়েছে Antwerpen বা Antwerp.

এই দেশের নাম সৃষ্টি প্রথম হয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন সেন্ট এলই ও সেন্ট আমাঁদ এখানে দুটি মঠ তৈরী করেন। তারপর অনেক হাত বদল ও অনেক লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে এখানে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্ল্যান্ডার্সদের রিজেন্ট ম্যাক্সিমিলিয়ান ব্রুজেসের লোকেদের হাতে ধরা পড়েন। অনেক রকম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়া পাবার পর ব্রুজবাসীদের উপর প্রতিশোধ নেয়। আন্টোয়ার্পকে ব্রুজের চাইতে বেশী সুবিধা দিতে থাকেন। অনেক কিছুর মনোপলি দেন, এলাম, মশলা ইত্যাদি।

কথা আছে না, কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। বন্দর হিসাবে আণ্টোয়ার্প পুর্ণিমার ষোলকলার দিকে এগুতে লাগল। আর ব্রুজেস গেল পিছিয়ে। সব দেশ ইটালী, জার্মেনী, গ্রেটব্রিটেন ইত্যাদি সকলেই এই বন্দর দিয়েই ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে আরম্ভ করল। এইভাবে আমস্টারডামের মত আণ্টোয়ার্পেরও বড় বন্দর হিসাবে চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সতের শ শতাব্দী হচ্ছে এখানকার স্বর্ণযুগ। অ্যালবার্ট ও ইসাবেলার রাজত্বকাল। যদিও এই জায়গা তখন ডাচদের নীচে। হলে হবে কি। তখন বিশ্ববিখ্যাত রুবেন্স, তার খ্যাতনামা ছাত্র সব ঠিক এই সময়ে চারদিক আলো করেছিল এবং ভ্যানডাইক বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। একে যদি সোনার সময় না বলা হবে তবে কাকে বলা যাবে।

মর্ত্যের মাটিতে এতগুলো তারার ঝিকিমিক কে কোথায় কবে দেখেছে।

হাঁ, ঠিক চোখের সামনে ভেসে উঠছে আমাদের দেশ। ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসে আছেন বিখ্যাত বীর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। সুসজ্জিত রাজসভা, সম্রাট সূর্যের মত সভা আলো করে রয়েছেন। তাঁর চারপাশে রয়েছে সব জ্যোতিষ্ক। কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শংকু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বররুচি, বরাহমিহির ইত্যাদি। এক একজন এক এক দিকে দিক্‌পাল। সেই এক স্বর্ণযুগ গেছে ভারতবর্ষের।

আণ্টোয়ার্পের স্বর্ণযুগে তার কৃতী সন্তানরা তাকে সুসজ্জিত করে তুলেছিল। তারপর উনিশ শতকে বেলজিয়াম আণ্টোয়ার্পকে নিয়ে স্বাধীন হয় ও সেই থেকে আণ্টোয়ার্প হচ্ছে বেলজিয়ামের সবচাইতে বড় বন্দর ও দ্বিতীয় বড় শহর। এখন এই বিরাট বন্দর বাইরে থেকে ইউরোপে জিনিস যাতায়াতের বলতে গেলে সব চাইতে বড় পথ।

এই শহরে এসে একটু জিরিয়েই ছুটলাম রুবেন্সের বাড়ির দিকে। এই বাড়ির নকশা উনি করেছিলেন। এর সামনেটা ও স্টুডিও হচ্ছে ইটালীয়ান রেনেসাঁস স্টাইলের। থাকবার দিকটা তখনকার ফ্লেমিশ

স্টাইনের এই বাড়িতে চিত্রকর তাঁর জীবনের পঁচিশ বৎসর কাটিয়েছেন।

ভ্যান ডাইক এই স্টুডিওতে অনেক বৎসর কাজ করেছেন। এরপরে আমরা গেলাম সেন্ট জেমস্‌এর গীর্জাতে। ওখানে বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রুবেন্সএর সমাধি রয়েছে আর আছে সেখানে এই ক্ষণজন্মার শেষের দিকের একটি বিখ্যাত চিত্র "হোলী ফ্যামিলী"।

সেন্ট অগস্টান গীর্জাতে আছে রুবেন্সএর আঁকা "মিসটিক ম্যারেজ" আর আছে স্বনামধন্য ভ্যানডাইকের "সেন্ট অগস্টাইন"।

এসব চার্চের বিষয়ে ওখানকার লোক কত ইতিহাস বলেছিল। কিন্তু অপূর্ব সব হাতে আঁকা ছবি দেখতে দেখতে মন আমার চলে গিয়েছিল সেই যুগে যখন রুবেন্স ছিলেন, ভ্যানডাইক ছিলেন।

দুই বিশ্ববিখ্যাত যুগজয়ী শিল্পী এঁকে চলেছেন। হাতে তুলি, পাশে নানা রঙের পশরা মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক-আশাক আবিন্যস্ত তুলি হাতে এঁকে যাচ্ছেন আবার কখনো কখনো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি তাঁদের মনের সঙ্গে কোথায় চলে যাচ্ছে বোঝা যায় না। ধ্যানের মূর্তি ছাত্রেরা পায়ের কাছে বসে অবাক বিস্ময়ে দেখছে।

পাশে পাশে ভেসে উঠল আমার ভারতবর্ষের অজন্তা চিত্রশিল্পের যুগ। রুবেন্স ত সেদিনের শিল্পী। তাই তাঁর সব কিছু আমরা পাই, জানি। কিন্তু ভারতবর্ষের সেই অজন্তার যুগ ছিল হাজার বৎসরেরও আগের। সেই যুগজয়ী স্রষ্টাদের কথা আমরা কিছু জানি না। এমনকি তাঁদের নাম পর্যন্ত।

দুর্ভাগ্য তাঁদের নয়। দুর্ভাগ্য আমাদের। যাদের সৃষ্টির গৌরবে আমরা বিশ্বের কাছে গৌরবান্বিত তাদের ঐতিহ্য আর কীর্তি ঠিকমত রাখতে পারি নি।

আমাদের দেশকে আমরা যুগ যুগ ধরে বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি নি। দেশমাতৃকার কোন কাজেই আমরা লাগতে পারি নি। শুধু আদায় করেছি, দেইনি কিছু।

ভাবতে ভাবতে চোখের কোণে জল টলটল করে উঠল। মনে হোল আমার নিশ্চয়ই এতটুকু ভাগ্য ছিল সেই যুগে জন্মাবার। সেইসব ধ্যান তপস্বীদের পায়ের কাছে বসে এক মুহূর্ত হলেও তাদের দিকে দেখবার। না হলে এত যুগ পরে কেন মন এত উতলা হয়।

লিমবার্গ জায়গাটির অনেকটাই মরুভূমি। এখানকার মাটিতে সব চাইতে যেটা বেশী জন্মায় তা হচ্ছে মানুষের কার্যক্ষমতা। মেয়ে-পুরুষ সকলেই কাঠের জুতো পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটিতে খাটে। বেলজিয়ামের মধ্যে এই জায়গাটির লোক হচ্ছে ফ্লেমিশ ভাষাভাষী।

এখানকার আবহাওয়াতে পাওয়া যায় দ্বি-ধর্মী হাবভাব। মডার্ন শহর। নূতন ফ্যাসানের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, চালচলন। আবার অন্যদিকে অতি আধুনিক পরিবেশে অতি পুরাতন কুসংস্কার। শহরের মধ্যেই এক মহিলাকে পাড়ার লোকেরা ডাইনীর কাজ করার দোষে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছিল। ব্যাপার শুনে ত আমি একেবারে থ। মহিলা বলে তার অতি আধুনিক রান্নাঘরে তার জাদুবিদ্যার বলে একটি কাল বিড়ালে পরিণত হত মধ্যরাতে। সেই বিড়ালকে যে দেখে তার অমঙ্গল হয়; কি তাজ্জব ব্যাপার বুঝে দেখুন।

এখানকার অর্থনীতির উন্নতির কারণ হচ্ছে দুটি—কয়লার খনি আর এলবার্ট ক্যানাল।

একটা কথা শুনে খুব অবাক লাগল ও ভালও লাগল। আঠার শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই শহরের অধিবাসীরা সুস্থ নাগরিকতার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতাবাসীরা যদি এই শতাব্দীতেও একটু নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় তবে এই কলকাতাই স্বর্গ হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

সকলে যদি নিজের মত করে এই শহরটিকে ভালবাসে। নিজের ভালমন্দের জন্য ত লোকে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার অর্ধেকও যদি নিজের দেশকে ভালবাসে।

এখানকার বেগিনাজ নামে একটি জায়গায় দেখলাম তের শ

শতাব্দীর ফ্রেস্‌কো। অর্থাৎ দেয়ালে আঁকা চিত্র। তারপরই ওখানে আমরা পাই সতের শ শতাব্দীর ফ্রেস্‌কো। খুব নামী লোকের আঁকা নয়। সহজ, সরল আঁকা তাও বুঝিয়ে দেয় এখানকার সর্বসাধারণ। লোকেরাও কত শিল্প ভালবাসে

মাঝের চার শ বৎসরের কিছু নেই। কেন তার কোন কারণই এরা বের করতে পারে নি।

এখানেই একজনের কাছে গিল শহরের একটা কথা শুনে শরীরের সব লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল। ছয় শ খৃষ্টাব্দতে একটি মেয়ে তার বাবার অত্যাচারে পালিয়ে আসে আয়ারল্যাণ্ড থেকে। মেয়েটি সাধারণ ছিল না অসাধারণ ছিল। সংসার তার মনকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি। অতি সাধারণ মাটির মানুষ তার বাবা এই দেবীর মত মেয়েকে একটুকুও চিনতে পারে নি। তার উপর অত্যাচার করেছে। এইখান পর্যন্ত তার বাপ মেয়ের পিছনে ছুটে আসে ও এইখানেই তার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

সেই মেয়েটি মারা যাবার আগে সেণ্ট ডিফন নামে পরিচিত ছিল। এখানে সেণ্ট ডিফন নামে গীর্জা তৈরী হয়। অনেক বৎসর পর্যন্ত এটি তীর্থস্থান ছিল। ছিটগ্রস্ত লোকেরা এখানে আসলে ভাল হয়ে যেত।

আমাদের দেশেও এরকম কত ছিল এবং এখনও অনেক শোনা যায়। ঐশ্বরিক শক্তি ঠিক কি তা জানি না। নিজের অভিজ্ঞতা বা চেনা জানার মধ্যেও বিশ্বাস করবার মত কিছু শুনি নি। তাই কোন কিছু বলা বড় শক্ত।

একটা কথা শুধু কানে বাজে :

"বিশ্বাসে মিলয়ে হরি
তর্কে বহুদূর"।

এরই কাছাকাছি একটি চার্চে দেখলাম লিওনার্ডো-দ্য-ভিন্‌চির একটি পৃথিবী বিখ্যাত চিত্র "লাস্ট সাপার"। কি অদ্ভুত সুন্দর। প্যারিসে দেখেছিলাম এরই একটি প্রতিলিপি।

এখানে কোচে করে যেতে যেতে চোখে পড়ছিল সাইকেল শুধু সাইকেল।

এ যেন এক সাইকেলের রাজ্য। জিজ্ঞাসা করে জানলাম এখানে সকলেই সাইকেল চড়ে।

পাশ দিয়ে দেখলাম তিন-চারটি নান্ বোঁ বোঁ করে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

কোচ এক জায়গাতে থামলে আমি একটি ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তোমরা এখানে সাইকেল করতে খুব ভালবাস না?"

"শুধু কি ভালবাসি? তুমি বিদেশিনী তাই জান না, আমি আমার গ্রামের সবচাইতে ভাল সাইক্লিস্ট। মনে আশা রাখি একদিন টুর দে ফ্রান্সে জিতব।"

তারপর জানলাম সাইকেল রেসে যারা ফার্স্ট হয় তারা হচ্ছে সকলের চোখে হিরো।

আরও একটা কথা শুনে অবাক হলাম, এখানে কবুতরের রেস ও মুরগীর লড়াই হয়।

মনে হয় এখানে বুঝি মানুষের চাইতে কবুতরই বেশী।

এসব শুনে মনে হচ্ছিল এই দেশটি ভারতবর্ষের থেকে এত দূরে কিন্তু বেশ কিছু বিষয়ে দৃষ্টিকোণ এক ধরনের।

আমাদের দেশেও ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগ পর্যন্ত কবুতরের লড়াই হোত। বড়লোক বা বনেদী জমিদারের মধ্যে হোত এই নিয়ে রেষারেষি। কারটা হারল, কারটা জিতল।

যেন এরই উপর নির্ভর করত তাদের মানমর্যাদা।

সেদিন আর অবশ্য নেই। গ্রামে গঞ্জে এখনও অবশ্য মুরগীর লড়াই আছে বা হয়। জনসাধারণের মধ্যে।

টনগেলোতে গিয়ে জানলাম রুবেন্স ও ভ্যান ডাইক নাকি প্রায়ই এখানে আসতেন।

এঁদের কিছু কিছু ছবি এখানে পাওয়া যায়। ভ্যান ডাইকের নামকরা ছবি "এ মন্‌ক্" হচ্ছে তাঁর নিজের ভাইকে মডেল করে

আঁকা। পৃথিবীর অনেক আশ্চর্যের এক আশ্চর্য হচ্ছে লুই জিমারের জ্যোতির্বিদ্যার ঘড়ি।

ফ্লেমিশ ভাষা ও ডাচ ভাষায় বেশ মিল আছে। আসল কথা হচ্ছে এটাকে ভাষা হিসাবে ধরা যায় না কারণ, এটা লিখিত ভাষা নয়।

ব্রাসেল্‌স থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে ব্রুজে গিয়ে পৌঁছে মনে হোল এমন শহরটি বুঝি আর কোথাও দেখিনি। এর মধ্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য আধুনিক যুগের সঙ্গে এমন মিলে মিশে আছে যে চোখ ও মন দুই জুড়িয়ে যায়। নিঃসন্দেহে ইউরোপের রূপসী নগরীদের মধ্যে যে এটি একটি সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রুজকে বলা হয় "সাগরের রাণী"।

এর পরেই গেলাম "নদী আর দ্বীপাবলী রাণী" ঘেণ্টে। এই শহরকে আবার আদর করে বলা হয় "Florence of the North"।

ঘেণ্ট শহরের বিশেষত্ব হচ্ছে সে অতীতকে নিজের মধ্যে বিলীন করে নিয়েছে। অতীতকে সরিয়ে দেয়নি, অতীতকে ভুলতে চায়নি। আবার অতীতের মধ্যে রয়েও যায়নি। ইউরোপের বেশীর ভাগ শহরই অতীতকে আলাদা করে দিয়েছে বা ভুলতে চেয়েছে

আবার ভারতবর্ষে দেখি বিপরীত চিত্র। অতীতের মধ্যেই যেন পুরোপুরি থাকার চেষ্টা। অতীতকে পাশে পাশে রাখার চেষ্টা।

এই শহরে অনেক কিছু রত্ন রয়েছে। কিন্তু সেসব দেখাবার জন্য তারা আগ বাড়িয়ে নেই। দেখতে চাও দেখ, না হলে দেখো না— এই উদাসীনতা আমার দেশেতে বড্ড বেশী রয়েছে।

এটা একটা ছোট দেশের একটি অতি ছোট শহর। এর যা শোভা পায় তা কি আমাদের বিরাট ঐতিহ্যে পূর্ণ দেশে থাকা উচিত?

আমাদের অতীতের এত কিছু আছে তা সুন্দর করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আমাদেরও অনেক দেবার, দেখাবার ও শেখাবার আছে। ঠিক সেইরকমই দুহাত ভরে নিতে হবে। তাই ত কবি বলেছেন:

"দিবে আর নিবে,

মিলাবে মিলিবে,

যাবে না ফিরে।"

ফ্লোরেন্সের মত এটাও হচ্ছে ফুলের রাজ্য। এখানে Horticultural শিল্প একটি বিরাট ব্যাপার।

প্রতি পাঁচ বৎসর এখানে এমন ফুলের মেলা হয় যা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়।

এই ছোট্ট শহর যুগ যুগ ধরে অনেক বীরকে জন্ম দিয়েছে যারা দেশ ও ধর্মের জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করে গেছে। মনে করিয়ে দেয় আমার ভারতবর্ষের মধ্যে রাজস্থানের কথা। যুগ যুগ ধরে জন্ম দিয়েছে অনেক বীরদের। প্রাণ দিয়েছে তারা দেশের জন্য।

বিশ শতকে সেই স্থান নিয়েছে আমার ছোট্ট বাংলাদেশ। কাতারে কাতারে লোক প্রাণ দিয়েছে দেশের মুক্তির জন্য।

ঘেণ্ট শহরটি হচ্ছে তিনটি নদীর সংযোগস্থলে। এলাহাবাদের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মত। অর্থনীতির দিকটা নির্ভর করে কয়েকটি জিনিসের উপর। ফ্রান্স থেকে যে খাদ্যশস্য আসে তা এখানকার বন্দর দিয়ে। তাই এই বন্দরের চারিদিকে খাদ্যশস্য মজুতের গোলাবাড়ি আছে।

তারপরেই হচ্ছে সুতী বস্ত্রের শিল্প। মোটে দশ বৎসরের মধ্যেই কটন ইন্‌ডাস্ট্রী এত বড় হয়ে উঠেছে যে দশ হাজার লোক সেই কারখানায় কাজ করছে।

তা ছাড়া এদের আছে ফুলের ব্যবসা! এইসব ছোট ছোট কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখে মনে হোল আমাদের দেশে সবচাইতে আগে দরকার গ্রামে, গঞ্জে, ছোট শহরে ছোট ছোট কারখানা গড়ে তোলা যাতে সেইখানকার লোকেদের আর বড় শহরে না আসতে হয়। নিজের দেশে থেকেই তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া বড় শহরও ভারাক্রান্ত হয় না।

কলকাতাকে দেখলে মনে হয় এত সে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে তার নাভিশ্বাস উঠছে। মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে সে পড়ে আছে। যে কোন সময় সে শেষ নিশ্বাস ছাড়বে।

কারণ একটিই। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে বা ছোট শহরে সে রকম কিছু নেই যা থেকে সেখানকার লোক করে খেতে পারে।

এখানকার সবচাইতে দামী ও নামী ছবি হচ্ছে "The Adoration of the Lamb" সেন্ট বাভোর ক্যাথিড্রালে। এই ছবিটি এঁকেছিলেন হিউবার্ট ও জেন ভ্যান ডাইক। পনের শতাব্দীতে তেলে আঁকা ছবি।

এখানে আছে বিবস্ত্র অদম্ ও ইভ্। এই ছবির পেছনে আছে অনেক লম্বা ইতিহাস। দ্বিতীয় জোসেফ এতে আপত্তি করেন। তখন আর একটি কাপড় পরান ছবি আঁকা হয় ও এই ছবিকে সরিয়ে রাখা হয়। তার কিছুদিন পরেই অবশ্য আসল ছবিটা রাখা হয়।

সতের শ নিরানব্বইতে এই ছবি ফরাসীরা লুভর্ মিউজিয়ামে নিয়ে যায়। নেপোলিয়ান হেরে যাবার পর এই ছবি আবার এখানে ফেরত নিয়ে আসা হয়।

তার পরেও দুবার জার্মানরা যখন এই দেশ জয় করে তখন এই ছবিটি তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এটি শেষে উদ্ধার হয় অস্ট্রিয়ার এক নূনের খনির কাছ থেকে। এখন এটি ঠিক জায়গাতেই আছে।

আমার সব শুনে মনে হোল ঘেণ্টের সকলেই এত কিছুর পর এই ছবির নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা না করে পারে না।

১৭

ছেলেবেলায় দেখতাম দেশের সেরা কেক পেস্ট্রি হচ্ছে সুইসদের তৈরী। সুইস কনফেকশনারী বললেই জিভে জল আসার যোগাড়। ভাবতাম নেস্‌লসের অমন চকোলেট আর টিনের কনডেনসড্ মিল্ক যে দেশ থেকে আসে সে দেশের জুড়ী নেই এ বিদ্যাতে। অতএব সুইজারল্যাণ্ডের ভক্ত ছিলাম।

পরে দেখলাম দুধ আর মাখনের তৈরী খাদ্যের দিক দিয়ে

হল্যাণ্ডও কম যায় না সত্যি কথা বলতে কি ডাচ চীজ আর মাখনের মধ্যে শুধু বর্ণে আর গন্ধে নয়, স্বাদেও এত বৈচিত্র্য পেলাম। তার ফলে হল্যাণ্ডকেও এক সারিতে বসিয়ে দিলাম। শুধু মনে নয়। খাবার টেবিলেও।

আরো যে ভাগীদার জুটবে তা কিন্তু কে জানত? বিরাট সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে দেখি নানান পেস্ট্রী উইথ ডেভনশায়ার ক্রীম। মুখরোচক স্ন্যাক্স উইথ ডেভনশায়ার চীজ চীজের নাম আর রঙের বাহারই বা কম কিসে।

তারিয়ে তারিয়ে এ সব চীজ চাখতে হয়। যে চীজটির নাম ব্লু স্টিলটন তাকে টুক করে গিলে ফেলা কি চলে? তা হলে যে তার নীল আভিজাত্যেরই অপমান।

সে বরাবরই একটু খাদ্যরসিক। বিলেতী বনেদী রুচি। খাদ্যের স্বাদের দিকে নজর, বেশী পরিমাণের দিকে মোটেই নয়। খাবার টেবিলে চীজের গল্প করতে করতে সে বলে বসল,—"জান, এদেশে একটি কথা আছে। চীজ ছাড়া অ্যাপল পাই হচ্ছে যেন আলিঙ্গন ছাড়া চুম্বন।

ইংরেজদের খাবারের অবশ্য সাদামাঠা বলে বদনাম আছে। কিন্তু পুডিংয়ের সম্মানে এ হেন রসাল কথার যে দেশে চলন আছে সে দেশের খাবার কি আর কম যাবে?

সে একটা চীজের রঙীন মোড়ক খুলে বলল— এটা চেখে দেখ দেখি, আজই এটা আবিষ্কার করেছি।

আমরা বাকী তিনজনেই, মানে আমি অনু আর ভরত খাবার টেবিলের কলম্বাসকে ধন্যবাদ দিয়ে নূতন মোড়কের মাল মুখে দিলাম। রংটা হালকা কিন্তু স্বাদটা ঠিক ধরা যায় কি যায় না। খেতে খেতে শেষে মনে হোল একটু মধুর মত স্বাদ জিভে লেগে আছে।

চলেছি সেই দেশে। হলিডের জন্য রূপকথার রাজ্য ডেভনে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে যেখানে রোদ আছে, বসন্ত আছে। রাবড়ীর মত ঘন আর মধুর মত স্বাদের ক্রীম যেখানে হয় সেই জায়গায়। থাকব কদিন।

এক্সিটারকে কেন্দ্র করে। ইংলণ্ডে এর বড় একটি কাউন্টি হচ্ছে এইটি।

লোকসংখ্যা এখানে এত কম যে বেশীর ভাগ জায়গা খোলামেলা শান্তিপূর্ণ। আমাদের দেশে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের শান্ত পরিবেশের জন্য অতি দূরে হিমালয়ের বুকে গিয়ে থাকতে হবে। এখানে তা মোটেই নয়। বেশ অনায়াসে প্রকৃতির কোলে মানুষের কোলাহল এড়িয়ে শান্ত পরিবেশে থাকা যায়।

এখানকার ডাটমুর ন্যাশনাল পার্কে শুধু পাহাড়ী ভেড়া ও বুনো ঘোড়া ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। মেয়ের কাছে এসব শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এখানকার এমন সব কিছু জায়গা যদি ফুস মন্তরে আমাদের দেশের মত জনবহুল দেশে নিয়ে যাওয়া যেত। ঠিক যেমন চেরাপুঞ্জির এক টুকরো মেঘের জন্য সাহারা মরুভূমি হাহাকার করছে।

চারিদিকে শুধু শ্যামলে শ্যামল। এখানকার মাটি লাল। সবুজ আর লাল এত মানিয়েছে। চেয়ে দেখি মেয়ের পরনে সবুজ শাড়ী আর লাল ব্লাউজ।—"আরে তাড়াহুড়োতে খেয়াল করিনি তুই যে সবুজ পরী সেজে এসেছিস।"

"এখানে আসছি বলেই ত।" মেয়ে মুচকে হাসল।

আর হাসল তোজো। সে হচ্ছে ফীল্ড মার্শাল। জাপানের নয়, মেয়ে জামাইয়ের সংসারের। জাতে স্প্যানিয়েল। কুকুর।

ডেভন জায়গাটি এত সুন্দর বলেই বোধ হয় অনেক নামী ও দামী শিল্পীর জন্ম হয়েছে এখানে। নামকরা কবি কোলরিজ এখানে জন্মেছিলেন এবং জীবনের বেশীর ভাগ এখানেই কাটিয়েছেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের নাম করা পেণ্টার সার জোস্থুয়া রেনল্ডস।

আমরা ত এসে ঢুকলাম হোটেলে। এত লম্বা পথ চালিয়ে ভরত ক্লান্ত। হাত মুখ ধুয়ে যেই বসেছি ভরতের এক বন্ধু মোটর নিয়ে হাজির। রাতের খাওয়া সেই খাওয়াল। তার পর আধো আলো আধো ছায়াতে কত দূর দূর সমুদ্রের পাড় ধরে নিয়ে গেল অপূর্ব সব দৃশ্য দেখাল।

এখানকার অধিবাসীরা শিল্পী মনোভাব নিয়ে যে জন্মাবে তা আর আশ্চর্য কি? আমারই ইচ্ছে করছিল কিছু আঁকি, কিছু ভাবি। তাই বুঝি আজকে কলম নিয়ে বসে পড়েছি। মনে হয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে ছিল মানুষ তার সৃষ্টির গুণগান করবে। কিন্তু মানুষ যে তাঁরই সন্তান। তাই ত তারাও চেষ্টা করছে নিজেদের নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করতে—তা সে যত সামান্যই হোক না কেন।

রাতে খাওয়া হয়েছিল একটি বাঙালীদের রেস্টুরেণ্টে। নিজেদের পশ্চিমবঙ্গে যা তারা করতে পারেনি তাই গুটি কয়েক বাঙালী সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে করেছে। যে কোন বিদেশী খাবার জায়গার সঙ্গে বন্দোবস্তে আর জাঁকজমকে পাল্লা দিতে পারে।

এরা পূববাংলার লোক। আমাদের দেখে কত খুশী। বাংলায় কত কথা বলল। যত্ন করে খাওয়াল। মনে হোল হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জন আপনজনকে কত কাল পরে কাছে পেলাম। ওদের ছেড়ে আসতে মোটে মন চাইছিল না।

উঠতেই হোল কিন্তু। রাতে হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে সকালে আবার সেই টোটো কোম্পানী। দুদিনের থাকার মেয়াদ।

এক্স নদীর পাশেই গড়ে উঠেছে শহর।এক্সিটার। এখানকার রুজমণ্ট দুর্গ খুবই শক্ত সমর্থ। অনেক কাল এটি শত্রুর হাত থেকে শহর ও শহরবাসীকে রক্ষা করেছে। এখন এর চেহারা গেছে পালটে। বেড়াবার সুন্দর জায়গা। সারি সারি গাছ রাস্তার দুদিকে। মায়েরা বাচ্চাদের প্র্যামে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্গের একটা দিক ঠিক মত রাখা হয়েছে। মনে হোল ভুল করে বুঝি ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে এসে জুড়ে গেছে এখানে।

এখানকার স্কুল কলেজ ও ইউনিভারসিটি বেশ নাম করা। আমরা সে পাশ মাড়াইনি। ছাত্রজীবন থেকে অনেক দিন আমরা সরে এসেছি। ভরত ও অন্নুর অবশ্য তা নয়। তবুও সদ্য ছেড়ে আসার প্রতি টান বোধ হয় কমই থাকে। তারপর আমরা গির্জা লাইব্রেরী

ইত্যাদি পেরিয়ে যেতে লাগলাম। সব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে জীবনের বেশ অনেকটা সময় এখানে কাটাতে হবে।

এসে দাঁড়ালাম, দি শিপ-ইন, নামে এক পুরোনো সরাইখানার কাছে। শুনলাম প্রথম রাণী এলিজাবেথের নৌ সেনাপতি অ্যাডমিরাল সার ফ্রানিসস ড্রেক-এর খুব আনাগোনা ছিল।

এলিজাবেথের সময় যে নূতন ইংল্যাণ্ড দিকে দিকে বড় হয়ে পৃথিবী বিখ্যাত হোল তার একজন কারিকর ছিলেন এই ড্রেক। সমুদ্রপথে অ্যাডভেঞ্চার, নৌ যুদ্ধে জয়, স্পেনের আক্রমণকারী নৌবহর আর্মাডার ধ্বংস এই সব দুঃসাহসী বীরত্বের জন্য বিখ্যাত হয়েছিল এই ডেভনশায়ারের মানুষগুলি।

তাদের কথা মনে পড়তেই একটি জীবন্ত রূপকথার কাহিনী মনে এল। সাত সমুদ্র পেরিয়ে যারা নতুন নতুন আবিষ্কার করেছিলেন তাদের মধ্যে রাজপুত্র যাকে বলা যায় তিনিও এই ডেভনশায়ারের লোক। সার ওয়ালটার র‍্যালে। রাজার ছেলে নয়, কিন্তু রাজার চেয়ে বেশী। প্রতিভায়, সম্মানে, সাহসে, জীবনের সবরকম সাফল্যে।

অক্সফোর্ডের ছাত্র, কিন্তু দুঃসাহসী দিগ্‌বিজয়ী। যেমন রাজপুত্রের মত চেহারা তেমনি মনোহর আলাপে, সরস আর সুপটু। তার বাহাদুরী আর বীরত্বের জন্য রাণী তাকে চল্লিশ হাজার একর জমি, লর্ডের পদমর্যাদা আর পার্লামেণ্টের মেম্বারশিপ দিলেন।

শুধু এখানেই যদি শেষ হত তাহলে রূপকথা হত না। চমক লাগালেন তিনি রাণীর পায়ের সামনে কাদার উপর নিজের চটকদার ক্লোকখানি পেতে দিয়ে। রাণী এলিজাবেথ তার রাজশকট থেকে নেমে তার উপর পা দুখানি পেতে দিলেন। লক্ষ্মী আর সরস্বতীর বরপুত্রের ভেলভেটের ক্লোকের উপর। অনুরাগে রাঙা ক্লোক।

রাণী প্রসন্ন। রোম্যান্স আর রূপ, রুপো আর বীরত্ব সব উজাড় করে ভাগ্য দিল র‍্যালেকে। কিন্তু তিনি রাণীর সঙ্গে অনুরাগে রাঙা মন নিয়ে থেমে রইলেন না। প্রেম করলেন রাণীর মেডঅব অনার প্রিয় সহচরী বেসের সঙ্গে।

এখানে বলে রাখি রাণী এলিজাবেথেরও ডাক নাম ছিল কুইন বেস।



অনুরাগে রাঙা ক্লোক।

রাণীর সভা থেকে একেবারে টাওয়ার অব লণ্ডন। প্রেমিকার সঙ্গে সেই কারাদুর্গ যেখানে রাণীর নিজের মা সৎমা আর অন্যান্য অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির মুণ্ড কাটা গিয়েছে।

এদিকে নতুন পৃথিবী আমেরিকার সোনার সন্ধান আর নব যুগের অ্যাডভেঞ্চারের তাড়না ইংলণ্ডকে মাতাল করে তুলেছে। এসব সফল করতে গেলে র‍্যালেকে চাই। তাই এই রাজপুত্রের তাসের দেশ আবার গড়ে উঠল। রাণী তাকে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে এল ডোরাডো সোনার দেশের সন্ধানে পাঠালেন। আটলান্টিক মহাসাগর পার

হয়ে আমেরিকার একটি নদীর বুক বেয়ে তার নৌবহর সাড়ে চার শ মাইল ভিতরে এগিয়ে গেল। কিন্তু মিলল না, কিছুই মিলল না।

কিন্তু রাজপুত্র ত। বংশে না হলেও বীরত্বে। দেশের শত্রু স্পেনের সঙ্গে লড়ে গেলেন। ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

এদিকে রাণী এলিজাবেথ মারা গেলেন। তার শত্রু মেরী কুইন অব স্কটের ছেলে জেমস হলেন ইংলণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের মিলিত রাজা। জেমস র‍্যালেকে সন্দেহ করে তার পদমর্যাদা ধনসম্পত্তি সব কেড়ে নিলেন। র‍্যালে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন।

অবশ্য তাতে সফল হলে রূপকথার খুঁত থেকে যেত। বিচারের প্রহসনের পর তাকে আবার পাঠানো হোল টাওয়ার অব লণ্ডনে। দীর্ঘ সাড়ে বার বছর, মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে বন্দী ছিলেন।

তার মন ত ছিল না বন্দী। সেখানে বসে তিনি বিখ্যাত পৃথিবীর ইতিহাস লিখলেন। আর নানারকম লাভজনক পরিকল্পনা নতুন রাজার কাছে পাঠাতে লাগলেন। লোভে পড়ে রাজা তাকে আবার আমেরিকা অভিযানে পাঠালেন। কিন্তু হায় র‍্যালে এবার ব্যর্থ।

এবার তার সোজাসুজি মৃত্যুদণ্ড হোল। কারণটা বড় অদ্ভুত। রাজনীতিক রাজা চেয়েছিলেন স্পেনের সঙ্গে মিতালী আর বিয়ের সম্বন্ধ। এদিকে র‍্যালে স্পেনের শত্রু। অতএব তাকে মরতেই হবে।

ফাঁসীর মঞ্চে উঠে এই রূপকথার রাজপুত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে তাকে আলোর মধ্যে মরতে দেওয়া হচ্ছে। খাঁড়া যখন ঘাড়ে নেমে আসছে তখন তিনি হেসে বললেন, "এতে আমি একটুও ভয় পাচ্ছি না। এটা বড় কড়া দাওয়াই, কিন্তু সব রোগের নিশ্চিত আরোগ্য করে।"

তারপর তিনি ঘাতককে ডেকে বললেন, ওহে, এবার কোপ মার।

এই রূপকথার নায়কের ভাগ্যের সবচেয়ে বড় পরিহাস এই যে সাত সাগর পেরিয়ে প্রাণ হাতে করে যেখানে তিনি সোনার সন্ধানে গিয়েছিলেন তার খুব কাছেই পরে সোনা মিলেছিল। অনেক অনেক সোনা।

র‍্যালের কথা ভাবতে ভাবতে ভারী মন নিয়ে সেদিনের মত যাত্রা শেষ করে ফিরে এলাম হোটেলে। রাত হয়েছিল বেশ। দোতলায় উঠতে উঠতে কানে এলো নাচের বাজনা। বুঝলাম বেশ বড় পার্টি চলছে। এই গোটা তল্লাটের বহু ছেলে মেয়ে এসে জমা হয়েছে। এদিকে আমাদের সবারই চোখে ঘুম। সোজা বিছানায় গিয়ে পড়া গেল।

পরের দিন উঠতে দেরি হোল। কোন রকমে সবাই গিয়ে বসা গেল ব্রেকফাস্ট টেবিলে। একেবারে রাজসিক খাবার। ভরত আবার যেমন দিল দরিয়া তেমনি হাত খোলা। "এতবড় হোটেলে এত পয়সা খরচ করে না উঠলেই হোত।" বলতেই বলে উঠল, "মা-মেয়েতে যাতে মন খুলে খরচ করতে পার তাই ত এত খাটি " কথাটা এত মমতা'ভরা সুরে বলেছিল যে মনে হয় না কোনদিন ভুলব।

দক্ষিণের দিকে যাওয়া গেল। উত্তর আর দক্ষিণের চেহারা বেশ আলাদা। উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর, এবড়ো খেবড়ো জমি কিন্তু হাওয়াতে যেন প্রাণ আছে। দক্ষিণ ঠিক উল্টো, নরম আরামদায়ক আবহাওয়া। এখানে শীতটা কিছু কম, গরমটা কিছু বেশী। বেশীর ভাগ সময়ই বসন্তের আবহাওয়া। যাকে ওদেশে বলে মেডিটারে-নিয়ান মানে ভূমধ্য সাগরের আবহাওয়া।

এলোমেলো অনেক ঘোরা হোল। এখানে আসা হয়েছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। তাই দুচোখ ভরে দেখলাম। মেয়ের কাছে শুনছিলাম ডার্টমুর ন্যাশনাল পার্ক ৩৬৫ বর্গমাইল জুড়ে। ওখানে পাহাড় আর জঙ্গল। অনেক কিছুর মধ্যে যেটা সব চাইতে মনে রাখার সেখানটা সব সময় কুয়াশায় ঢাকা আবছা অন্ধকার। দিনের আলো বড় একটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। জলাভূমিও যথেষ্ট রয়েছে। বেশ বোঝা যায় তাই কোনান ডয়েলের রহস্য কাহিনী "হাউণ্ড অব বাসকারভিলের" পরিবেশ ওখান থেকেই নিয়েছিলেন।

আমরা চলেছি ফিরে লণ্ডনের দিকে। বেচারা ভরত, বেশ বুঝতে পারছি, একটানা চালিয়ে ক্লান্ত বোধ করছে। পথের ধারে

অবশ্য প্রায়ই হোটেলে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া হচ্ছিল। ইয়োরোপের সব বড় মোটর পথেই মাইল পনের পরে পরেই এই ব্যবস্থা আছে।

সন্ধ্যে নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম হোম সুইট হোমে। প্রাণ জুড়িয়ে গেল দেখে মেয়ে-জামাইয়ের বিড়াল 'পাজি' আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে

১৮

গ্লস্টারশায়ার-এ যাবার কথা হচ্ছিল।

"ওখানে যাবার কথা মনে হলেই গাটা কেমন শিউরে ওঠে। আবার অন্য দিকে মনে হয় বৃটেনের জীবন হচ্ছে নদী টেম্স। যে ওখানেই প্রাণময়ী হয়ে ওঠে।"

আমার কথা শুনে মেয়ে আমার দিকে তাকাল। "অমন কথা কেন বললে? কেন গা শিউরে ওঠে। জায়গাটি ত বেশ সুন্দর শুনেছি, গভীর উপত্যকা শ্যামল ঘাসে ঢাকা, আর আছে—ছুটে চলা নদী। সব মিলিয়ে সুন্দর'মন ভোলানো দেশ।"

"ঠিকই বলেছিস। কিন্তু ওখানকার ডিউকদের ইতিহাস? শেক্সপিয়ারের "কিং লিয়ারে" ডিউক অভ গ্লস্টারকে দুর্জন ব্যক্তি দেখিয়েছেন। আবার দেখি রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও তৃতীয় রিচার্ড-এর সময় ডিউক অভ গ্লস্টার চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতক কাজ করেছে।"

"ঠিকই বলেছ। আশ্চর্য, অত সুন্দর জায়গা থেকে অত খারাপ লোক কি করে যে জন্মায়। বিচিত্র এই জগৎ।"

সে ফিসফিস করে বলল—কিছু ভেবো না। দুর্জনদের কথা মনে থাকবে না এমন একটি বস্তুর সঙ্গে ও জায়গাটার নাম জড়িয়ে আছে।

আমরা ত হা হা করে উঠলাম। সে কি ব্যাপার। অমন যে শেক্সপীয়র তার সৃষ্টিকেও ভুলিয়ে ছাড়বে! এমন কি বস্তু বটে?

"ছাড়বেই ত।" সে হেসে বলল, "তোমরা কেক পেস্ট্রি চকোলেট এসবের সন্ধান কর। এসবের স্বাদের তারতম্য বিচার কর। আমি বলি কি গ্রস্টার জিঞ্জার ব্রেড এক টুকরো মুখে দাও। তোমাদের ঐসব সুইস পেস্ট্রির কথা স্রেফ ভুলে যাবে। আর যদি নোন্তা কিছু মনে ধরে ত কর্নিশ পেস্টি খেতে পার। আধখানা চাঁদের মত চেহারা। মাংস পিয়াজ আর সব্জী ভরা মুচমুচে পাই। এক নম্বর ময়দায় তৈরী।

আমি বাধা দিলাম—তুমি শুধু ছাই খাবারের কথা তোল এ দেশে এসে তোমার হয়েছে কি বলত ?

সে হেসে বলল, হয়েছে অনেক কিছু। খাবারগুলোর চেহারাই এত স্মার্ট সুন্দর তাদের সাজগোজ এত মনোলোভা আর কাগজের কার্টনগুলিও এত ঝকঝকে ছবিওয়ালা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলেই ওরা মন কেড়ে নেয়। মুখও তৈরি হয়ে পড়ে।

"মেয়ে সাবধান করে দিল—কিন্তু বাবা, জন্ম থেকে দেখে আসছি, তুমি বেশ মাপাজোখা একখানা ফিগার বজায় রেখে চলেছ। অবশ্য বলতেই হবে দেশের উচ্ছের শুক্ত, মৌরলার ঝোল আর পেঁপের চাটনীর দৌলতে। এখন এখানকার এইসব খেয়ে সামলাতে পারবে না।"

মেয়ের ভয় দেখানোকে সে গ্রাহ্যই করল না। হেসে বলল, আলবৎ সামলাতে পারব। যেমন খাব তেমনি খাটব। মানে পায়ে হাঁটব। রোজ খাব নতুন খাবার। যেমন মজাদার তেমনি মুখরোচক।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার লেটেস্ট ডিসকভারি নূতনতম আবিস্কার কোনটা ?

হেসে সে বলল, "খেয়াল করনি বুঝি ? এই উইম্বলডনের বাড়ি থেকে ওয়েস্ট এণ্ডে যেতে পথে পড়ে চেলসী পাড়া। যত উঠতি শিল্পী আর উটকো ফ্যাশানের পূজারী সেখানে ভিড় করেছে। দি গ্রেট আমেরিকান ডিজাস্টার মহান আমেরিকান সর্বনাশা নামের

রেস্তোরাঁর মত হাম্‌বারগার আর মিল্‌ক্‌ শেক নাকি আটলান্টিকের এপারে আর হয় না।

মেয়ে আঁৎকে উঠল—বাবা, ওসবে যে বড্ড মুটিয়ে দেয়।

সে ভরসা দিয়ে হাসল—মাভৈঃ আমিও ওখানে লাইন দিই মাঝে মাঝে।

এখানেও কিন্তু শেষ নয়, সে বলল, মধুরেণ সমাপয়েৎ করবার জন্য খাব ডেজার্ট ক্রীম ডারিয়োল একখানা করে। ফেটানো ঘন ক্রীমের উপরে রেড-কারান্ট জেলি আর নীচে কাস্টার্ডের টার্ট। সবার উপরে ভাসবে ছিটে ফোঁটা ব্রাণ্ডির হাল্কা গন্ধ। খাব আর ভাবব, ব্রিটিশরা বোকা। তাই ওরা বলে যে ওরা খায় নেহাত বাঁচতে হবে বলে। খেয়ে মজা পাবে বলে নয়।

শেষ পর্যন্ত সব ভাবনা একপাশে করে সকলে গ্লস্টারের দিকে রওনা হওয়া গেল।

পথে যেতে যেতে দেখলাম রঙীন চঙীন সব পাহাড়। এখানকার পাথর দিয়ে এদেশের রংকে রং এর বাড়ি তৈরি হয় মিষ্টি মধুর রং-এর বাড়ি, গুরুগম্ভীর ছাই রংএর গির্জা কত কিছু যে চোখে পড়তে লাগল। মনে হচ্ছিল এদেশের নির্মাণ কৌশল অন্যান্য কাউনটির থেকে অনেক আলাদা।

ওখানে অনেক হোটেল আছে। কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম কোথাও না থেকে রাতেই মোটর চালিয়ে ফিরে আসব

রাতে যে ড্রাইভ করে তার সত্যিই বেশ কষ্ট হয়. বিশেষ করে একজনকেই যদি করতে হয়।

রাতের একটা আলাদা রূপ আছে যেটা এদেশে আমার দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত করা হয়েছিল।

পথেই সকালের খাবার খেয়েছিলাম তাই সোজা চলে গেলাম ওখানকার চার্চে।

রোমানদের সময় এই জায়গাটি ছিল ওদের একটি বেশ নাম করা কলোনী।

নরম্যানরা আসার আগে রাজা এসে এখানে থাকতেন, আর ছিল এখানে টাঁকশাল।

এ থেকেই বেশ বোঝা যায় এই জায়গাটি কত বেশী নামী ছিল।

গির্জাটি দেখে দুঃখ হোল। বাইরে থেকে এত সুন্দর কিন্তু ভিতরে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই।

গির্জা ছাড়া এই শহরের পুরোনো যা কিছু সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শহরের মধ্যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বলতে গেলে কিছুই নেই। সবই আনকোরা ঝকঝকে তকতকে।

সত্যি কথা বলতে কি গির্জার যুগের পর যুগের বিকাশের মধ্যে ওদের দেশের ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মন্দির শিল্পের মতই। স্যাকসন, নর্মান, প্রথম ইংলিশ, টিউডর রিনায়সেন্স এরকম যুগে যুগে নূতন ধারার রচনা পদ্ধতি পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

আমাদের দেশের মঠ আর মন্দিরের মতই ওদের দেশেও লেখা-পড়া শেখার জায়গা ছিল গির্জার লাগোয়া আর ধর্মের আওতায়। এমনকি ফোরাম বা মার্কেট প্লেসেও গড়ে উঠত। আশেপাশে শিল্প-সঙ্গীত ধর্মপ্রাণতা সবেরই বিকাশ হ'ত সঙ্গে সঙ্গে।

গ্লস্টারের গির্জায় উইলিয়াম দি কনকারারের বড় ছেলের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে একটা কথা মনে হোল। ওদের দেশেও "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা" সমানভাবে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ধর্মস্থানগুলি থেকেছে অক্ষত। বহন করে চলেছে ভক্তি আর ঐতিহ্যের ধারা। ওই এলাকায় চোদ্দ শ বছর আগে যিনি রাজা ছিলেন তার মরদেহও সসম্মানে গ্লস্টার গির্জায় এনে রাখা হয়েছে।

দু হাজার বছর আগে গ্লেভাম নামে যে রোম্যান শহরটি এখানে স্থাপিত হয়েছিল তার কেল্লাটি লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু তার কাহিনী ঘিরে কত রূপকথা কত গবেষণা। সব কিছুরই যে মূল্য আছে এদেশে। তাই সামান্য হয়ে ওঠে অমূল্য। মানুষের ভালবাসায়

মানুষের তৈরী সৌন্দর্য থেকে সরিয়ে এবার আমরা কট্‌স্‌লন্ড কানট্রির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে গেলাম। মে মাসে যখন সবই টাটকা তরতাজা সবুজ হয়ে ওঠে অথবা হেমন্তে যখন গাছের পাতা আর মাঠের ঘাস ব্রোঞ্জ রং থেকে ধূসর হয়ে যায় তখনো ইংলণ্ডের প্রকৃতি অপরূপ রূপেই সেজে থাকে। বিশেষ করে এখানে। এখানকার একটি বিশিষ্ট জায়গা হচ্ছে চিপিং নরটন।

নামটা শুনে কেন জানি না আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। চিপ থেকে নিশ্চয়ই নামটা এসেছে।

"আমার মনে হয় ওখানে নিশ্চয়ই জিনিস খুব সস্তা। মার্কেটে ঘুরে ফিরে কিছু জিনিস কেনা যাবে।"

"মা, তোমার এই উদ্ভট ধারণা কোথা থেকে হোল ?"

"কেন ? নামটা দেখছিস না, চিপ থেকে নিশ্চয়ই হয়েছে।"

"তা কেন হতে যাবে," মেয়ে বলল, "তুমি আবার আমাকে প্রশ্ন কোর না কি করে হোল। আমি কিন্তু জানি না।"

এই শহরটি আশপাশের চাইতে উঁচু তাই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

এটি একটি বড় মার্কেট সেন্টার। শহরে ঢুকতেই চোখে পড়ল রাস্তার দুধারে এনটিকের দোকান।

মনে হোল এখানকার লোকেদের বেশ ব্যবসায়ী বুদ্ধি আছে। তারা বোঝে এনটিকের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য জিনিসের কদর হবে বেশী। তাই দোকানে শুধু সাজাবার জিনিস না রেখে এনটিক টেবিল চেয়ার ইত্যাদিও রেখেছে।

মেয়ে বলল, "চল আমরা প্রথম যাই রোল রাইট স্টোনের দিকে।"

ওখানে গিয়ে সত্যযুগের সব নানা ধরনের পাথর দেখে মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি বা প্রস্তর যুগেই ফিরে গেছি।

"এখান থেকে চল সরে পড়া যাক। না হলে বোধহয় আমরাও পাথরে পরিণত হয়ে যাব।"

"ওসব বাজে চিন্তার চাইতে চল প্রথম এখানকার প্রসিদ্ধ ডোনাট

খাওয়া যাক। তিন শ বছরের পুরোনো পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু ডোনাট তৈরী হয়। এতে এমন পেট ভরে যাবে আর কিছু খাবার জন্য সময় নষ্ট করতে হবে না।"

আমরা সোজা চলে গেলাম ওখানকার নাম করা চার্চে।

আগের কালের লোকেরা সব দেশেই মনে হয় ধর্মভীরু বা ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত।

তখন এখনকার মত করবার বা ভাববারও বোধ হয় বিশেষ কিছু ছিল না। আমাদের দেশ যেমন মন্দিরময় ও দেশটাও গির্জায় ভরা।

আমরা গিয়ে ঢুকলাম চার্চ অভ সেন্ট মেরী দি ভারজিনে। এ অঞ্চলের একটি বিখ্যাত গির্জা।

পনের শতকের উল অর্থাৎ পশম ব্যবসায়ীদের তৈরী। ভিতরে দেখলাম অনেক সুন্দর সুন্দর পিতলের জিনিস আছে। ভারী সুন্দর রঙীন কাঁচের জানলা চোখে পড়ল।

আমরা কিছুক্ষণ পুলমেডো গির্জার মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম। খুব ভাল লাগছিল।

চিপিং নরটন থিয়েটারের পাশ দিয়ে গেলাম, ঢুকিনি অবশ্য।

বেশ রাত হয়ে আসছে। চারজনে গিয়ে ঢুকলাম রেস্টুরেন্টে। সকলের পেটেই আরশোলা ডন মারছে।

বেচারা ভরতকে আবার গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।

বললাম রাত ত হয়েছে। বেশী আর কমের কোন তফাত নেই। বাড়ি পৌঁছে বেশ ভাল করে ঘুমনো যাবে।

এ দেশের সব বড় মোটর পথেই হলদে রঙের আলো। আর পাশের শহরগুলিও চারিদিকে আলোয় ঝলমল করে। মনের খুশীর পরশে হলদে আলোকে মনে হয় সোনালী। সোনালী মিছিলের মধ্যে দিয়ে আমরা চললাম ফিরে। মনে হচ্ছিল এ ত মাটির দেশ নয়, এ যেন নানা রং-এর তুলিতে আঁকা রূপকথার ছবি।
